তবু কল্পনা নিজের সম্বন্ধে বেশ খানিকটা সচেতন—নিজের অবস্থা সম্বন্ধেও। ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য কতখানি জানি না কিন্তু পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতি ওর চারপাশে এমন একটা গণ্ডী টেনে দিয়েছিল যাকে ডিঙিয়ে আসবার মত অন্তরঙ্গ ওর বড় একটা কেউ ছিল না। নিজের বাড়ীর লোকের সঙ্গেও বড় একটা মানিয়ে নিতে ও পারত না; বোধ হয় খানিকটা ঝাঁঝ তাই ওর স্বভাবের মধ্যে লুকিয়ে থেকে থেকে হঠাৎ মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠত।

অনেকদিন আগের কথা—যখন ওরা থাকত উত্তর-বাংলার অখ্যাত একটা রেলষ্টেশনের ধারে ছোট্ট একটা গ্রামে। লোকের বসতি কম,—নিত্য আত্মীয় কুটুম্ব সমারোহ নিয়ে বিব্রত হতে হয় না এখানে—বেশ সচ্ছলভাবেই দিন কেটে যেতে পারত—কিন্তু গেল না তার কারণ ওরাই। মধ্যবিত্ত ঘরে এতগুলি মেয়ের জন্মের জন্য বাবা মা ঈশ্বরকে দায়ী করতে না পারলেও মানুষে তাদেরই দায়ী বলে ধরে নিল। এক একটি মেয়েকে তার চিরজন্মের ঘর খুঁজে সেখানে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পালন করতে করতে সুখ, স্বস্তি, সম্ভ্রম কিছুই আর বাকী রইল না। অনেকগুলি বোনের একটি বোন কল্পনা, দিদিদের বিয়ের লাঞ্ছনায় বাবার সদা-শঙ্কিত, লজ্জিত, অপরাধীর মত ত্রস্ত চেহারা, মার নীল হয়ে যাওয়া মুখে অপমানের চিহ্ন আঁকা—অল্প বয়সেই তার মনে গভীরভাবে দাগ কেটে দিয়েছিল।

সব জিনিষ তলিয়ে দেখবার মত বুদ্ধি তখনও হয়নি, শুধু মনে পড়ে রাত্রে একা শুয়ে শুয়ে চোখের জলে মাথার বালিশ ভিজিয়ে ভাবত—কেন বাবা চুপ করে থাকে? কেন কিছু বলে না—কেন? কেন?

সহজভাবে বাঁচবার অধিকার—সুন্দর জীবন সৃষ্টি করবার অধিকার থাকবে তাদেরও।

অথচ এদের দেখেই গলির মধ্যে বসন্ত ঋতু হঠাৎ এক ঝলক হেসে গেলেন এই আশ্চর্য্য।

২

সন্ধ্যার সময়টা হাতে কাজ থাকে না, ওদিকে কল্পনার পরীক্ষারও দেরী নাই মোটে। রোজই তাই একবার করে কল্পনাদের বাড়ীতে ঘুরে যেতো প্রকাশ। যেটুকু সম্ভব সাহায্য পাবার আশায় কল্পনা নিজেও অনুরোধ জানিয়েছিল তাকে আসতে।

ছেঁড়া র‍্যাপারটা গায়ে দিয়ে রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে অনেক এলোমেলো কথা তার মনে পড়ছিল। শীত এবছরে একটু বেশী পড়লেও কলকাতার রাস্তা নির্জ্জন করে তুলবার মত নয়। যুদ্ধের গতি যতই বার্ম্মার দিকে এগিয়ে আসছে, এখানেরও সাবধানতা বেড়ে চলেছে ততই। ব্ল্যাক-আউট, জানালা দরজা বন্ধ, কথাবার্ত্তার আভাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্ততঃ করল সে, এবার কি অন্য সবার পন্থা অনুসরণ করেছে নাকি এরা ?

আস্তে করে টোকা দিল দরজায়, রাণু—

কল্পনা ঝনাৎ করে দরজা খুলে ধরল—ওঃ তুমি—এত আস্তে ডাকো যে বুঝতেই পারছিনা কে এলো। বস—তোমার আজ এত দেরী হল যে ?

এমনিতেই অবশ্য আটটা বাজলো এখন। মানুষের সাড়া-শব্দ পাচ্ছ না বলেই আরও মনে হচ্ছে রাত বেশী হয়েছে। তোমাদের বাড়ীতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল নাকি ? কাউকে দেখছি না যে ?

দেখবে কি করে ? কেউ লেপের তলায়, কেউ রান্নাঘরে। আমার তো আর ওসব বালাই নেই—থাকি পথের দিকে তাকিয়ে।

ছিলে নাকি ? কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল—খুব একটা গভীর ঘুম দিচ্ছিলে এবং হঠাৎ উঠে বসে ভীষণ রকম বিরক্ত হয়ে পড়েছ তুমি।

তাও হতে পারি—এ সংসারে কিছুই অসম্ভব নেই তা জানে তো ?—খিল খিল করে হেসে উঠল সে।

কার সঙ্গে গল্প করছিস—রাণু ?

কল্পনার দিদি ঘরে এসে ঢুকলেন। চৌদ্দ বছর বয় হতেই বিয়ে হয়ে যাওয়াতে—সংসার সম্বন্ধে অত্য সতর্কতা—আর সেইজন্যে হয়ে উঠেছেন ভয়ানক রকমের রুগ মেজাজের।

এমন ভাব দেখান যেন এত বড় মেয়ের বিয়ে না হওয়াটার সমস্ত লজ্জা তাঁরই মাথার উপর এসে জমা হয়েছে। কথাবার্ত্তার সেই ভাবটাই ফুটে ওঠে বেশী। প্রকাশকে তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না—তার কারণ সে পুরুষ মানুষ, তা'ছাড়া যে কোন মেয়ের কাছে থেকে তার ভালোলাগা আদায় করবার ক্ষমতা আছে সেটাও তো একটা দূষণীয় ব্যাপার—বিশেষতঃ কল্পনার সঙ্গে বন্ধুত্বট যেন দিন দিন ছাপিয়ে চলেছে।

এমন সময় হঠাৎ যে ?—শরীর ভাল তো প্রকাশ ? ইচ্ছা করেই একটু আশ্চর্য্য হবার ভান করেন তিনি।

প্রকাশের চোখে সেটা এড়িয়ে যাবার কথা নয়—তবু সে হেসেই উত্তর দিল—আমি তো ভালই—রাতে না হলে কি আর পড়াবার মত সময় আমি পাই ?—তা রাণু এমনই অকৃতজ্ঞ যে সে উপকারটুকু পর্য্যন্ত স্বীকার করতে চায় না। এমন ভাব দেখায় যেন পরীক্ষাট পর্য্যন্ত ওর নয়—আমার।

তাই নাকি ?—চমৎকার একটা ভঙ্গী করলেন মুখের—আমাদের কালে তো আর পড়াশুনার বালাই ছিল না—যে জানব লেখাপড় রাতে না দিনে কখন ভাল হয়। চৌদ্দ বছর না হতেই শ্বশুরবাড়ীর বউ

হয়ে সংসারের ঝঞ্ঝাট পোহাতে পোহাতে হাড় কালি করে ফেললুম—আর এরা………

বাধা দিয়ে প্রকাশ বল্লে—আপনাদের ক্ষমতাই যে আলাদা রকমের দিদি, একালের বাবু মেয়েরা কি আর তা পারে? ও কথা ভাবাই অন্যায় হয়ে পড়েছে এখন।

তা তো বটেই। এই দেখ না—আজকাল যুগ যেন উল্টে এসেছে। কোথাকার মানুষ কোথায় চলে যাচ্ছে—এতদিনের ঘর-সংসার পর্য্যন্ত তছনছ হয়ে পড়ছে, খেয়াল করছে কেউ? পালাতে পারলেই যেন বাঁচে। আমাদের কালে হলে—সব গুছিয়ে-গাছিয়ে বেঁধে-ছেঁদে তবে যা হোক্ একটা করতুম—পাঁচদিক দেখে শুনে, আর এরা—বাবা, যেন ঘোড়ায় জিন্ কষে এসেছে!

প্রকাশ সায় দিল—তা তো বটেই। তা দেশশুদ্ধ লোক যখন পালাচ্ছে তখন দু'চার জনই বা থাকে কি করে? আপনারা যাবেন না?

যাব বই কি ভাই, না গেলে প্রাণটা যদি যায় তা'হলে ধন-দৌলতে আর কি হবে বল? তা একেবারে ঠিক হয়নি আমাদের যাওয়া—এনাদের আবার মত হয় না।

দিদি কল্পনার দিকে চেয়ে কটাক্ষ করলেন। সেও চুপ করে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, ঝাঁঝালো সুরে বল্লে,—আমার মতের খবর নিতে এসেছ নাকি প্রকাশদা?—তা'হলে দয়া করে জেনেই ফিরে যাও—বাজে বকবার মত সময় আমার নেই, খালি সময় নষ্ট।

যাচ্ছি গো যাচ্ছি—সোজা কথায় বল্লেই পারতিস—মুখনাড়া না দিয়ে। দিদি রাগ করে উঠে গেলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রকাশ বল্লে—

কেন অনর্থক দিদিকে চটালে বলত? কি যে তোমার অভ্যাস লোককে ঘা দেবার—এর কোন অর্থই হয় না।

আঘাত দেবার কারণ হয়ত নেই—কিন্তু না থামালে দিদি সমানে বসে বক্ বক্ করত তা জানো? পড়াশুনা তো হতই না—কথাবার্ত্তাও।

কথাবার্ত্তা কি দিদির সামনে হয় না?—এখন লুকোচুরি করাটা কি ঠিক?

লুকোচুরি করার প্রবৃত্তি আমার নেই—তবে দিদিকে উঠিয়ে দিলাম ডিসটার্ব্ব করবে বলে।—কিন্তু সে কথা কেন বলত?—তোমার কিছু দরকার আছে দিদির সঙ্গে?

দিদির সঙ্গে দরকারের জন্যেই যেন আসি—না রাণু? কেন আসি যেন জানো না!

তুমিও জানো না, তোমার এ বাড়ী আসা কেউ পছন্দ করে না, এবং নিজের থেকে আসা না বন্ধ করলে ও'রাই বন্ধ করাতে বাধ্য করবেন, বুঝলে?

বুঝলাম, কিন্তু তোমার কি কিছু বলবার নেই?

বলবার হয়ত ছিল কিন্তু উপায় নেই। তুমি তো জানো জোর দিয়ে বলবার মত অবস্থা আমার নয়—আজো তো আমার কোন সম্বল নেই!

কল্পনা মাথা নীচু করতেই—প্রকাশ দু'হাতে ওর মুখখানা তুলে ধরল জোর করে। তোমার হয়ত নেই—আমারও নেই—কিন্তু একটা কথা শুধু বল—সে সম্বল যদি কখনো হয় তা'হলে আজকের কথার বাকীটুকু জেনে নেবার জন্যে ডাকবে কি?

মুহূর্ত্তের জন্যে কল্পনার চোখ ছল ছল করে উঠল—ডাকব প্রকাশ, কিন্তু সেদিন তুমি কোথায় থাকবে আর আমি কোথায় থাকব তা কে জানে?—হয়ত আর নাও হতে পারে।

হতেও তো পারে—আর পারার আশাটাই তো মানুষের সবচেয়ে বড় সম্বল একথা ভুলে যাচ্ছ কেন বলত ?

তা'হলে.........

তা'হলে আর কিছু নয়—আমি যাই—এবার রাত হয়ে গেল অনেকটা পথ যেতে হবে, তুমিও আর সময় নষ্ট করো না—পড়ো। পরীক্ষার তো আর দেরী নেই।

অন্ধকার রাত—আরও অন্ধকার হয়ে এসেছে রাস্তার ধারের আলো নেভানো অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়ানো লাইট-পোষ্টগুলোর গায়ে লেপা কালির রঙে। জাপানী বোমার আক্রমণ হতে বাঁচতে হলে মাথার উপর কালো রাতের অন্ধকারের আচ্ছাদন ছাড়া আর কোন আবরণ নেই বাংলার রাজধানীর। অপরিসীম দুর্গতির লজ্জায় অধোবদন হয়ে আকাশভরা আলোর উপরেও ধোঁয়ার পর্দ্দা টানা—মুখ দেখাবার সখ তারও নেই।

বই খাতা গুছিয়ে তুলতে তুলতে কল্পনার মনে হল ওর জীবনের নূতন অধ্যায়ের প্রথম পাতায় আজ কালির অক্ষরে কিছু লেখা হল—এই পথ দিয়েই এগিয়ে চলতে হবে তাকে—ভাল না মন্দ কিছু বিচার করবার উপায় নেই—দিন কাটবে, সেও এগিয়ে যাবে। নিজের হাতে বরণ করে নেবার আনন্দে পথের দুর্গতিকে ভুলে যাবে বই কি ! দুঃখ থাকলেও, এখানে আছে নিজের পায়ে চলবার একটা পরিতৃপ্তি, তাই বা ক'জনের ভাগ্যে মেলে ? যদি ডুবেও যেতে হয়—তবু স্রোতের টানে এগিয়ে মিলিয়ে না যেয়ে ঘূর্ণী হাওয়ার মত বিপ্লব সৃষ্টি করেই যাবে সে।

৩

দিদির অনুমান মিথ্যা হল না, পাড়ার অন্য সকলের দেখাদেখি এদের বাড়ীতেও যাবার আলোচনা চলতে লাগল। চলবে না-ই বা কেন, দেখতে দেখতে পাড়াটা খালি হয়ে এসেছে, বাকী সকলেই জিনিষপত্র গোছাতে সুরু করে দিয়েছে, সকাল-বিকালে বাইরের বারান্দায় জমে ওঠা মজলিসে ভাঙন ধরে গিয়েছে।

যারা এখনও বাড়ীর মমতা ছাড়তে পারছে না তাদের মধ্যে তেলী-বাড়ীর শ্রীপতিই প্রধান, অনেক টাকার কারবার তার, হঠাৎ বন্ধ করে দিলে লাভের অঙ্ক কমে যাবার আশঙ্কা আছে। গত মহাযুদ্ধের ফলে সাফ্ রাস্তা দিয়ে লক্ষ্মীদেবী সোজা এসে ঘরে আসন পেতে বসেছেন, একটু অবহেলা দেখালে অন্তর্দ্ধান করতেই বা কতক্ষণ? একেই তো বাজারে ভদ্রমহিলার মোটেই সুনাম নেই—নেহাৎ ছট্‌ফটে আধুনিকা মেয়ের মতই চঞ্চল প্রকৃতি তাঁর।

সুতরাং যাওয়া চলে না, বাড়ীর মেয়েদের অবশ্য নিরাপদ স্থানে পাঠান চলে কিন্তু তাতেও আর এক বিপত্তি—দ্বিতীয় পক্ষের আহ্লাদী বউ মানদার জন্য। স্বামী ছাড়া তার এক মিনিটও চলে না এবং স্বামীটির অবস্থাও ঠিক তারই মত।

আরও দু'চারজন এত চট্ করে যেতে চাইল না, তাদের মধ্যে অনেকেই তরুণ সম্প্রদায়ের—বোমা পড়বার মজাটা যদি একটু-আধটু না-ই দেখা হল তা'হলে আর জীবনে হল কি?

ফলে অল্পদিনের মধ্যেই নূতন একটা দল গড়ে উঠল। পাড়ার নিষ্কর্ম্মা, আল্‌সে, হঠাৎ বসন্তের ছোঁওয়া-লাগা ছেলের দল খুব খানিকটা হৈ-চৈ করে নিল। খানকতক কঞ্চি যোগাড় করে এনে বত্রিশ ইঃ

ছাতি ফুলিয়ে যুদ্ধের মহড়া আর বোমার প্রিকশান নিতে সুরু করল। বিপন্ন মেয়েদের সাহায্যের জন্য একদল ভলাণ্টিয়ার গড়ে উঠল—সকাল বিকাল সারা গলিটা টহল দিয়ে বেড়িয়ে সজাগ কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগল।

সব থেকে খুসী হল সেনবাবুর ছেলে হরি আর পালেদের বাড়ীর নানু। এ পাড়ায় নানু রীতিমত লিডার বললেও চলে, একে তো সে বছর দুই কলেজের ক্লাস করেছে, তার উপর মুখে মুখে ছড়া বাঁধতে, দু'চার কলি গান গাইতে, আর বারোয়ারী পূজার চাঁদা তুলতে ওস্তাদ বলে সকলেই ওকে মেনে চলত বেশ একটু। নিজেদের মধ্যে কমিটি গড়ে তুলবার কৃতিত্বে নাওয়া-খাওয়া পর্য্যন্ত ভুল হয়ে যাবার উপক্রম হল তাদের।

হরির অনেক দিনের সাধ বুকে পিঠে ব্যাজ এঁটে, টুপি মাথায় দিয়ে ভলাণ্টিয়ারী করবার—কিন্তু এ পর্য্যন্ত সুযোগ জোটেনি কোথাও। প্রথম প্রথম দু'একটা দলে নাম লেখাবার সুবিধা পেলেও—গোল গোল প্রায় ছিট্‌কে আসা চোখে ছ' বছরের তরুণী থেকে আরম্ভ করে বাষট্টি বছরের যুবতীদের দিকে সমানভাবে তাকাতে দেখে এবং মেয়েদের স্নানের ঘাটের দিকে ঘোরাঘুরি করার ফলে শেষ পর্য্যন্ত কোথাও টিঁকতে পারেনি। পত্রপাঠ বিদায় করে দিয়েছে তারা—দলের বদনাম করতে কেউ রাজী নয়।

তা'ছাড়া কল্পনাদের বাড়ীতে দুটো তিনটে বড় বড় মেয়ে আছে—যদি ওরা থেকে যায় তা'হলে বোমার গণ্ডগোলে যখন সকলেই সাড়ে বত্রিশ ভাজার মত মিশিয়ে যাবে তখন খুব গভীরভাবেই পরিচয় করবার সুযোগ পাওয়া যাবে মনে করতেই আহ্লাদে তার দাঁতগুলো পর্য্যন্ত বাইরে উঁকি মেরে গেল।

সঙ্কীর্ণ গলির মুখের সামনে দাঁড়িয়ে ওরা জটলা করে চলছিল, এগিয়ে আসতে যেয়ে থমকে দাঁড়াল প্রকাশ। প্রতিদিনকার অভ্যাস মত আজও সে এই রাস্তা দিয়েই হেঁটে চলেছিল এখানেই আসবার জন্য—অবশ্য সে এলে কেউই তাকে খুসী মনে অভ্যর্থনা করবে না তা জেনেও। কল্পনা নিজেও সহজভাবে নিতে পারবে না তার আসাটা কারণ তা'হলে যে অপমানের আশঙ্কায় সে নিজেই ওকে এখানে আসতে বারণ করতে চেয়েছিল—তাই ঘটবার সুযোগ দেওয়া হবে।

তবু প্রকাশ এগিয়ে আসছিল পায়ে পায়ে—চলেই যখন যাবে আজ-কালের মধ্যে—কিন্তু পথের উপরেই বাধা পেল।

কোথায় যাচ্ছ প্রকাশ? আমাদের ওখানে? কেন বলত? —প্রায় সামনে এসে দাঁড়াল কল্পনা।

তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম রাণু—চলেই তো যাবে, দু'একটা কথা বলবার ছিল। ভালই হল এখানে দেখা হয়ে—বাড়ীতেই যাবে তো এখন? প্রকাশ ওর মুখের দিকে তাকাল।

না,—আমাদের বাড়ীতে তুমি যাও এটা আমার ইচ্ছা নয়। বরং চল ট্রামে করে ঘুরে আসা যাক্—

উত্তরের অপেক্ষা না করে সে হাত তুলল, পার্ক সার্কাস লেখা ট্রামখানা থামতেই উঠে পড়ল,—পিছু পিছু প্রকাশও।

খানিকক্ষণ কারো মুখে কথা নেই। মসৃণ রাজপথের উপর বাজতে লাগল ট্রামের চাকার ঘর্ঘর শব্দ। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রকাশ একবার পার্শ্ববর্ত্তিনীর দিকে তাকালে—জানালার উপর একখানা হাত রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে কল্পনা উদাস দৃষ্টিতে—মুখের উপর মনের কথার এতটুকু রেখাও পড়েনি। সুকুমার, প্রশস্ত কপালের উপর এসে দু'চার গোছা চুল দুলছে, বাতাসের দোলায় কাঁপা নূতন আমের মঞ্জরীর মত।

সার্কুলার রোডের বড় গোরস্থানের কাছে আসতেই সচকিত হয়ে উঠল সে—নামো, নামো, গ্রেভ ইয়ার্ডটা পার হয়ে যাচ্ছে যে। ওখানে দিব্যি বসবার জায়গা পাওয়া যাবে।

হুড়মুড় করে নেবে পড়ল দু'জনে। ছোট, বড়, ফুলে ঢাকা দু'এক লাইন কবিতা লেখা অনেকগুলি সমাধি ছাড়িয়ে ওরা এসে পৌছাল বাংলার কবি মধুসূদনের সমাধির কাছে। নির্জ্জন, আভরণহীন নেহাৎ সাদাসিদে একটা জায়গা, কচি ঘাসের আসন পাতা তার চার দিকে।

পা ছড়িয়ে বসে পড়ল কল্পনা,—বসো এখানে—তোমার কথা শুনে নিই। আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছো কেন?

এমনিই—কিন্তু সে কথা যাক্—বলত এখানে এসে বসলে কবির সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী ষ্ট্রাইকিং বলে কি মনে হয়?—

তোমার কি মনে হয় তা তো বলতে পারিনে, কিন্তু আমার কি মনে হয় শুনতে চাও?

বল না শুনি—তোমার কথা শুনব বলেই তো বেরিয়েছিলাম।

আমার মনে হয়, জানতে ইচ্ছা করে—এত বড় একটা প্রতিভা, এত বড় একটা যুগের প্রতীক এই মধুসূদন সত্যিকার কাউকে ভালবেসেছিলেন কিনা—আর যদি বেসে থাকেন তো কাকে বেসেছিলেন? কেন তার প্রেমে নিজের জীবনের সর্ব্বনাশা পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে বাধা পেলেন না, বলত?

সে প্রশ্নের উত্তর কবে কার কাছে পাবে বল? সময় যে দাঁড়াতে জানে না ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মুখের দিকে চেয়ে—তার মুখে যে নেই ভাষা—কে মেটাবে তোমার এ কৌতূহল? তবু আমার মনে হয়

প্রতিভা হচ্ছে আগুন--নিজেই সে জ্বলে যায়--জ্বালায়—নিঃশেষ হয়ে যায় তার প্রেমও, সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ থাকে লুকিয়ে—আগুনের থেকে আলাদা করে দেখা যায় না তাকে।

দেখা যায় না—না? আচ্ছা মানুষের কথা কেন ছবির মত রূপ নিতে পারে না বলত? জিজ্ঞাসা করে আর জানতে হত না কিছু তা'হলে—চোখের সামনে ভেসে উঠত মনের কথার রূপের খেলা—তোমার আমার আরও সবার!

আর সবার মনের কথার খবর নেই আমার কাছে—তবে আমার চাও তো দিতে পারি—তোমারও। চাও শুনতে?

কল্পনার হাতখানা জোর করে চেপে ধরল প্রকাশ—শুনবে আমার কথা?

দুষ্টামীর স্বরে উত্তর দিলে কল্পনা—ও আবার শুনব কি? তোমার কথা আমিই তো বলে দিতে পারি।

কি বলত।

বললে কি দেবে?

যা চাঁও—আমাকে।

শ্যামল মুখে ঘনিয়ে এলো লালিমার আভা—ভারী অসভ্য হয়েছ আজকাল তুমি। মুখে কিছু আটকায় না— না?

আটকাবে কি করে? তোমার শাসন নেই যে।

শাসন করব কি করে বল? তার দায়িত্ব নেবার শক্তি থাকা চাই তো।

দেখি তোমার হাত দু'খানা—ফুলের মত নরম বলে তো মনে হচ্ছে না, এ হাতেও যদি ভার নিতে না পার তা'হলে আর কি পারবে কোন দিন?

নিশ্চয়ই পারব দেখে নিও।

বেশ খুসী হলাম জেনে। বিচ্ছেদ যদি ঘটেই তা'হলেও আশা রইবে মনে মনে।

এবং কইবে কথা কাণে কাণে—গুনগুনিয়ে উঠল কল্পনা। যাক্ সন্ধ্যে হল—এবার বাড়ী ফেরা যাক্।

তাতো যাবই কিন্তু—চলে যাবার আগে আমায় কিছু বলে যাবে না রাণু—আজকের সন্ধ্যাটিকে মনে করে রাখবার জন্য ?

প্রকাশের পাশে সরে এল কল্পনা—আজকের সন্ধ্যাটিকেই তো তোমায় দিয়ে গেলাম প্রকাশ, তোমার দিন রুটিনের মত ছক্ কাটা, আমারও বড় হবার সাধনা—কঠিন সেই ব্রত—ফাঁকি দেবার মত অবসর আজও হয়নি আমাদের। তবু তারই থেকে আড়াল করে ধরা অল্প এই সময়টুকু অক্ষয় হয়ে থাক মনের স্মৃতিতে—এই থাক আমাদের সম্পদ !

তাই থাকবে রাণু—এর বাড়া আর দেবার মত ধন কারো ভাণ্ডারে তো নেই।

৪

কয়েকটা দিন কেটে গেছে তারপর কতো তারিখ মনে পড়ে না, কলেজে টেষ্ট পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেছে। ইংলিশ দু'টো পেপার হবে শুধু। সকাল সকাল খেয়ে কল্পনা পরীক্ষা দিতে চল্ল।

এ বছর পরীক্ষায় কোন ভীতিকর মাধুর্য্য নেই; কোশ্চেন পেপার ছাপানো হয়নি—প্রেসওয়ালারা টাকা চায় অসম্ভব রকমের বেশী —যুদ্ধের দরুণ খরচ বাড়বার অজুহাত। এ কলেজটা নূতন, বেসরকারী। কয়েকজন শিক্ষাব্রতীর আপ্রাণ চেষ্টায় সবে মাত্র গড়ে উঠেছে বলা যেতে পরে। এ বছরই য়্যাফিলিয়েশন পেয়েছে— খরচ চলে না, ছাত্রী আনতে হয় কনসেশানের সুবিধা দেখিয়ে।

বোর্ডে খড়ি দিয়ে প্রশ্ন লিখে দেওয়া হল। পরীক্ষাও দিতে এসেছে অল্প ক'টি মেয়ে। অনেকেই চলে গেছে এদিকে ওদিকে যার যার বাড়ীর অভিভাবকদের ইচ্ছামত। পরীক্ষা দিতে বসল এরা ক'জনেই। দারোয়ান পর্য্যন্ত পালিয়ে গেছে——ঘণ্টা বাজাবার কাজটা পর্য্যন্ত প্রফেসরদের হাতে এসে পৌছেচে!

অন্য বছরের মত এবার লম্বা প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়নি—সময়ও কম, মাত্র দু'ঘণ্টা। টিফিনের বালাই নেই—ফাষ্ট পেপারটা হলেই সেকেণ্ড পেপার লিখতে দেওয়া হবে। বোর্ডের আর এক পিঠে সেকেণ্ড পেপারের কোশ্চেন পর্য্যন্ত লিখে রাখা হয়েছে।

লিখতে মন লাগছে না। কারও রেঙ্গুণে বোমা পড়েছে, শুধু তাই নয়—সহর ছেড়ে দলে দলে লোক পালাচ্ছে,—সহপাঠিনীরা অনেকেই পরীক্ষার আগেই পিঠ্‌টান দিয়েছে। দোতালার উপর পরীক্ষার লম্বা হল্‌টা টিম্ টিম্ করছে—মাত্র জন বারো।

পরিক্ষার্থিনীকে নিয়ে। গার্ড দেওয়া দরকার মনে করেনি কেউ, সব প্রফেসরেরই মুখ শুকনো চেহারা উস্কোখুস্কো—নিজেদের ভিতরেই তাঁরা নীচুগলায় আলোচনা করছেন।

খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দলে দলে লোক চলেছে গাড়ী বোঝাই করে, পায়ে হেঁটেও চলেছে অনেকে, ঠেলা গাড়ীতে মাল চাপিয়ে। কলকাতা সহর আর বাসের যোগ্য নয়, যে কোনও মুহূর্ত্তে বিপদ আসতে পারে।

এই ললিতা—পাশের মেয়েটিকে ছোট্ট করে একটু ধাক্কা দিল কল্পনা—তোর কতটা লেখা হল ?

ঘোড়ার ডিম; কিছু পড়েছি নাকি যে লিখবো? পড়তে কি আর মন লাগে আজকাল ? তুই ?

আমিও তোরই মত; যা পড়েছি তা স্বয়ং মা সরস্বতীই জানেন। হ্যাঁরে, তোরা চলে যাবি নাকি অন্য কোথাও ?

যাব তো নিশ্চয়ই কিন্তু কবে যে যাব সেইটেই ঠিক হয়নি। দীপুদের পরীক্ষা হয়ে গেল, এইবার ট্রান্সফার করে যা হয় একটা কিছু হবে।

তা'হলে তো তোদের যাওয়া একরকম ঠিক, আমাদেরই কিছু হয়নি ঠিক এখনও।

সেকিরে ? তোরা যাবিনে ? থাকবি কি করে ? জানিস—কলকাতায় প্রতিদিন হাজার হাজার গোরা সোলজার আসছে। ওদের উপদ্রবের ভয় কি কম ?

সে তো নিশ্চয়ই—বিদেশীর হাত থেকে নিজেদের দেশের আর দেশের মেয়েদের সম্ভ্রম বাঁচাতে হ'লে দেশ ছেড়ে পিঠ্ টান না দিলে চলবে কেন ? যাব আমরাও—কিন্তু কবে সেইটেই তো ঠিক হতে যা দেরী আছে।

তাই বল; এই উমা, তোরা যাবি নে?

উমা মেয়েটি গালে হাত দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে এক মনে কি ভাবছিল—চমকে উঠে বল্লে—কি বলছিস তোরা?

বলব আর কি? এখন লোকের মুখে মুখে যে কথা আমরাও তাই বলছি।

চলে যাবার কথা বলছিস? তোদের ভাই দেশ-ঘর আছে আত্মীয়-স্বজন আছে, তোরা যেতে পারিস। আমরা ছাই যাব কোথায় বল? না আছে দেশ বলে কিছু না আছে দু'দিন কারো কাছে গিয়ে থাকবার মত আত্মীয়-কুটুম্ব।

কেন দিদিদের বাড়ীটাড়ীও নেই?

থাকবে কি করে শুনি? আমিই তো বাড়ীর বড় মেয়ে, আমার বিয়ে হলে বরং ছোট ভাইবোনগুলো বলতে পারত দিদির বাড়ী যাব, তাকি ছাই বিয়েটাই হয়েছে—যে চট্ করে শ্বশুরবাড়ী পালাব?

রীতিমত দুঃখের কথা। বিয়ে না হলে অনেক র... বিশ্রী অবস্থায় পড়তে হয় শুনেছি কিন্তু পালাবার জায়গার অভা... ড়তে হয় এ ভাই জানতুম না কোনদিন।

মৃদুকণ্ঠে হেসে উঠল ক'জনেই—যারা এদের আলোচনা... যোগ দেয়নি তারাও একবার মুখ তুলল ঈষৎ সচকিত ভাবে।

এমনি সময় প্রিন্সিপ্যাল এসে ঘরে ঢুকলেন। ভীত, সন্ত্রস্ত চেহারা। অনাহার আর উদ্বেগের চিহ্ন পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে সমস্ত মুখখানায়। মেয়েরা সবাই তাঁর দিকে উৎকণ্ঠিতভাবে চাইল।

মেয়েরা শোন—ভাঙা গলায় বললেন তিনি—তোমাদের সেকেণ্ড পেপার আর পরীক্ষা হবে না, এবারের এমার্জেন্সী অবস্থার জন্য টেষ্ট

মা অত বুঝলেন না, ভাবলেন হয়তো যাওয়া দরকার, কাজেই বাড়ীময় একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। অনেকদিন সহর ছেড়ে এসেছে ওরা, এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছে না কিছুতেই। পদে পদে ঘটছে ত্রুটি, তার চেয়ে ফিরে যাওয়া ঢের ভাল। তা'ছাড়া আত্মীয়ের বাড়ীতে দীর্ঘকাল চেপে বসে থাকাটা ঠিক শোভনীয়ও নয়। ফিরে যাওয়া দরকার—সে তো শুধু লেখাপড়ার জন্যেই নয়, মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, ভবিষ্যতের একটা কিছু বন্দোবস্তও করতে হবে, উদাসীন ভাবে ঘুরে বেড়ালে চলবে কেন আর? তারাই বা আর কতদিন—বয়স তো হয়েছে।

রবি গিয়ে খবরটা দিতে মাসীমাও দিদির কাছে জানতে এলেন হ্যা দিদি, সত্যি নাকি? রবি যেয়ে বল্লে বটে কিন্তু আমার তো বিশ্বাস হল না। ঝঞ্ঝাটের সময় অত বড় বড় মেয়েদের নিয়ে তুমি ফের কলকাতায় যাবে?

না যেয়ে কি করব বল—মা বল্লেন, সংসারটাই তো আমার সেখানে—ছেলে ক'টা ওখানেই পড়ে রইল। তা'ছাড়া মেয়েদের বিয়ে-থাওয়ার বন্দোবস্ত তো করতে হবে, না যেয়ে উপায় কি?

মেয়েদের বিয়ের জন্যে তোমার আবার আর এক মুল্লুক যেতে হবে কেন? এদেশে কি মেয়ের বিয়ে হয় না? রাজা উজীর না চাও তো চলতি ভাল ছেলে এখানেও বেশ পাওয়া যায়।

রাজা উজীর চাইব কোন্ মুখে বল? মেয়েও আমার ডানাকাটা পরী নয়, সামর্থ্যও তেমন নয়। একটু লেখাপড়া জানা, স্বভাব-চরিত্র ভাল, মোটা ভাত-কাপড়ের দুঃখ নেই—এমন হলেই আমার ঢের—আছে নাকি জানা-শোনা তোর? ঘাড় থেকে বোঝা নামাতে পারলে আমি তো বেঁচে যাই।

বলব এখন তোমার ভগ্নীপোতকে। কত লোকের মেয়ের বিয়ে ঠিক করে দেয়, আর তোমার মেয়ের কি দেবে না? জাম[illegible]বের তো আর কাজ নেই, কথাবার্ত্তা বলে ঠিক করে নেবেন।

মাসীমা কোন কাজটাই আধখানা করে ফেলে রাখতে পারেন না, চেনাশুনা সবাইকে লাগিয়ে দিলেন পাত্রের খোঁজে। ছোট্ট মফঃস্বল সহরটা শুদ্ধ সবাই জেনে গেল ওদের জন্য স্বয়ংবর সভার আয়োজন হচ্ছে।

গোলমালে আসল কথাটাই চাপা পড়ে যায় দেখে কল্পনা নিজেই বাবার কাছে এসে হাজির।

বাবা, আমার কথাটা শোন। খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে বাবা ওর দিকে তাকালেন—বল, কি বলবে।

শান্ত, অসহায় মানুষটিকে ব্যস্ত করে তুলতে তার নিজেরও যথেষ্ট সঙ্কোচ হচ্ছিল, তবু না বললেই নয় বলে কোনমতে বলেই ফেল্ল কথাটা।

তুমি আরও পড়তে চাও?—বেশ। যদিও মেয়েদের অত পড়াটা কোন কাজেই লাগে না তবু আমার আপত্তি নেই। তুমি পড়তে আরম্ভ করে দাও।

পড়তে হলে, ইউনিভারসিটিতে ভর্ত্তি হওয়া দরকার, আমাকে তো তা'হলে কলকাতা যেতে হয়।

কেন, তুমি প্রাইভেটে পড়।

প্রাইভেটে তিন বছরের আগে দিতে পারব না। তা'ছাড়া কোচিংএর লোক চাই, তা এখানে পাব কোথায়? একটা লাইব্রেরী পর্য্যন্ত নেই।

তা'হলে আর কি করা যাবে? তুমি যদি এভাবে ম্যানেজ না করতে পার তা'হলে তোমার পড়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

ম্যানেজ করতে আমি বেশ পারব—আমার খরচ দু'টো টিউশানী করলেই হয়ে যাবে। সে কথা ভাবছি না, আমার কলকাতা যাবার একটা ব্যবস্থা তো করা দরকার।

কলকাতা তোমায় আমি পাঠাতে পারি না গম্ভীর ভাবে তিনি ঘাড় নাড়লেন,—কোথায় থাকবে? কোথায় যেয়ে উঠবে বল? যুদ্ধের জন্য আমাদের জীবনের ঢের ওলট-পালট হয়ে গেছে, তোমাকেও কিছু ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হবে।

তার মানে তাকে পড়া ছাড়তে হবে? অসম্ভব, তা কিছুতেই হতে পারে না। ওর এতদিনের পরিকল্পনা, এতদিনের আশা এইভাবে নষ্ট হয়ে যেতে দিতে সে পারে না, এর জন্য দরকার হলে সে অবাধ্যও হবে। কিন্তু চলে যাবার টাকাই বা কোথায় পাবে সে? হাতে তো তার একটা পয়সাও নেই; চিঠি লিখতে হলে পর্য্যন্ত মার কাছে পয়সা চাইতে হয়। অবাধ্য হতে হলেও স্বাবলম্বী হওয়া দরকার। হঠাৎ ওর চোখ ফেটে জল এলো। কি করতে পারে সে এখন? এটা নিতান্ত অচেনা জায়গা, সহর হলেও বা চাকরী-বাকরীর চেষ্টা দেখতো। না আছে এখানে রোজগারের উপায়, না আছে সোজা কোলকাতা ফিরে যাবার কোন সহজ পন্থা। ট্রেনের সময় জানা নেই, ট্রেন-ভাড়াও নেই। সবচেয়ে বড় কথা তিন মাইল দূরের ষ্টেশনে কোন্ রাস্তা দিয়ে যেতে হয় তাও তার জানা নেই। হায় রে কপাল……

কল্পনারা চলে যাবার পরেই কলকাতার বাসা উঠিয়ে দিয়েছিল প্রকাশ, কিন্তু প্রায়ই একবার করে কলেজ ষ্ট্রীটটা ঘুরে যাবার দরকার হয়ে পড়ত।

আজও তাই—সকালের ট্রেনে সে কলকাতা এসেছে। বাড়ীতে পাঠাবার মত কয়েকটা জিনিষ কেনা দরকার। রজনী চিঠি লিখেছে মার পরণে আর একখানাও আস্ত কাপড় নেই। এক জোড়া কাপড় কিনতে প্রায় সমস্ত মার্কেটটা ঘুরতে হল—জিনিষের দাম য[illegible] চড়েছে তা যে কোন ভদ্রলোকের কল্পনার বাইরে—তাও আবার মেলে [illegible]। দরিদ্রের সম্বল মাত্র পনেরোটি টাকা হাতে করে সে বাজার করতে এসেছিল—মার কাপড়, বাবার জন্য একটা পাঞ্জাবী, রেণুর ফ্রক, রজনীর বই—আরও কিছু কিছু জিনিষ কেনা দরকার—অথচ এক জোড়া কাপড় কিনতেই তো সব টাকা চলে গেল এখন উপায়? ভাবতে ভাবতে আসছে প্রকাশ—সামনে পড়ে গেল সত্যেন।

কিহে! এত মনোযোগ দিয়ে কার কথা ভাবছ বলত? প্রেয়সীর? কতদিনের বিচ্ছেদ হল?

তা একবছর হতে চল্ল—কিন্তু প্রেয়সীর কথা ভাবছি না, ভাব[illegible] অন্য জিনিষ—তুমি চলেছ কোথায়?

চলেছি যদি কোথাও যাওয়া চলে, কিন্তু প্রেয়সীর কথা না ভেবে কোন্ ভাগ্যবতীর কথা ভাবতে ভাবতে এমন বিভোর হয়ে চলেছ শুনতে পারি?

পারবে না কেন? যার কথা ভাবছি, তিনি হচ্ছেন এই বাজারের চড়া দাম। জিনিষ কেনবার দরকার তো অনেক—কিন্তু সঙ্গতি নেই।

অর্থাৎ—

অর্থাৎ, পনেরোটি টাকা হাতে করে বেরিয়েছিলাম, একজোড়া সাড়ী কিনতেই তা গেল ফুরিয়ে, এখন বাকীটার উপায় ভাবছি।

যদি কিছু মনে না কর—তা'হলে আমি কিছু সাহায্য করতে পারি।

পকেট ভারি আছে বুঝি? কিন্তু কি মনে করব, দান না ধার।

যেটা ইচ্ছা মনে করতে পার, আমার কোনটাতেই অমত নেই।

ধন্যবাদ, কিন্তু আমার একটাতেও মত নেই।

মানে,—ধার নিতেও তোমার আপত্তি?

নিশ্চয়ই—এবং আমার মতে ওটা থাকা উচিত, কেন না গ্রহণ করা মানেই হাত পাতা। ওতে নিজেকে ছোট করা হয়, অমর্য্যাদা করা হয়।

বন্ধুর কাছেও?

বন্ধুর চেয়ে যে প্রিয় তার কাছেও। নেওয়া যায় কার কাছ থেকে জানো? যাকে দেওয়া যায় নিঃশেষ করে নিজেকে—নইলে আদর্শকে করা হয় খাটো, আমার দ্বারা সে সম্ভব নয়।

তুমিই মানুষ—

এখনও হইনি তবে হবার সাধনা করছি।—সে যাক্—তুমি চলেছ কোথায়? চল না আমার ওখানে—দিনটা কাটিয়ে আসবে।

আপত্তি নেই—তোমার মত আমার অত প্রিন্সিপ্‌ল্‌-এর বালাই নেই—বন্ধুর কাছে হাত পাততেও নেই লজ্জা।

লোক্যাল ট্রেনে ফিরতে বড় জোর আধঘণ্টা সময় লাগে, গঙ্গার উপরেই প্রকাশের নূতন বাসা—সামনের দিকটা লতাপাতায় ঘেরা,

চেনা অচেনা নানান্ রঙের ফুল ফুটে রয়েছে সেখানে। সত্যেনের ভারী ভাল লাগল।

চমৎকার জায়গাটা তো,—আপত্তি না থাকে তো কিছুদিন কাটিয়ে যেতে পারি।

স্বচ্ছন্দে, তবে দুপুর বেলাটা একা থাকতে হবে। আমার তো আফিস আছে। তোমার জন্যে ছুটি তো আর পাব না—অতিথি-সংকারের কাজটা তোমাকেই ম্যানেজ করে নিতে হবে।

প্রকাশদা, আসি? ছোট্ট একটা ছেলে দরজার উপরে এসে দাঁড়াল—আজকে তুমি যাবে তো ভাই?

নিশ্চয়ই যাব, কাল আমার শরীরটা খারাপ ছিল বলে যেতে পারিনি, তা তুই এলি কেন মণ্টু? এতটা রাস্তা আবার যেতে হবে তো হেঁটে? কে আসতে দিল তোকে?

কেউ দেয়নি আমি নিজেই এলাম—বেশী হাঁটিনি ..., কালীতলার কাছ থেকে রূপোদাদা সাইকেলে তুলে নিয়েছিল। তুমি কি এখন যাবে প্রকাশদা?

সত্যেন মনোযোগ দিয়ে ছেলেটিকে দেখছিল, দরিদ্র ঘরের ছে... অনাদর আর অল্প আহারে বাড়তে পারেনি, চোখে মুখে কি... প্রতিভার ছাপ—হয়ত পথ দেখালে ও একদিন মানুষ হয়ে ...ত পারত।

একি, একে কোথা থেকে জোটালে বলত—তুমিই বা চলেছ কোথায়?.

প্রশ্নের উত্তর দিলে তুমি ঠিক বুঝতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না, দেখতে চাও তো সঙ্গে আসতে পার। ঐটি আমার কুড়িয়ে পাওয়া ভাই।

বিশ্বেষু ভ্রাতৃবৎ। আইডিয়াটা ভাল, চল দেখেই আসা যাক্।

ওর বিদ্রূপে প্রকাশ উত্তর দিল না কিন্তু মনে যেন কোথায় একটা কাঁটা খচ খচ করতে লাগল। এরা কি এমনই উদাসীন হয়ে রইবে চিরকাল? বিশ্বজোড়া অন্ধকারের মাঝে নিশ্চেষ্ট হয়ে মিশিয়ে যাবে? চেয়ে দেখবার চেষ্টা করবে না তবু?

মাঝারি সাইজের একটা রেশনের থলি ভর্ত্তি করে নিতেই মণ্টু বলে উঠলো—একটু চিনিও নিও প্রকাশদা, ছোট্ট খুকুটা আজ সারাদিন কিছু খেতে পায়নি।

চিনি তো বড় বেশী নেই কিন্তু খুকু খায়নি কেন? ওর জন্যে দুধ নেওয়া হত না?

হত তো, কিন্তু কাল থেকে সে বন্ধ করে দিয়েছে, কাল খুকুকে একটু ফ্যান খাইয়ে রেখেছিল দিদি—আজ কি খাবে?

আধঘণ্টার মধ্যেই ওরা মণ্টুদের বাড়ী পৌঁছে গেল, সরু পায়ে চলা রাস্তা এসে দু'পাশের ঘন জঙ্গলে মিশে গেছে। মস্ত একটা পিপুল-গাছের নীচে হেলে পড়া একখানা মাটির কুঁড়ে, কাছাকাছি আসতেই শিশুর গলায় অস্ফুট কান্নার শব্দ শোনা গেল।

মণ্টু সজোরে প্রকাশের হাত চেপে ধরল—খুকু কাঁদছে প্রকাশদা, খিদেয় কাঁদছে।

ওদের সাড়া পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল আর একটি মেয়ে। রোগা, লম্বা একহারা চেহারা, কোলে একটা ন্যাকড়া জড়ান পুঁটুলী—কান্নার শব্দ তার মধ্যে থেকেই আসছে।

অপরিসীম মমতায় প্রকাশ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল—আজ কেমন আছিস্ রেণু?. চিনি চেয়েছিলি? ওইটুকু বাচ্ছা চিনি খেতে পারবে?

মাথা হেঁট করেই রেণু উত্তর দিল—পারবে, চিনির জল করে খাইয়ে দেব।—মণ্টু এ-কে একটু ধরতো।

মণ্টু পারবে কেন? আমার কাছে দে—তুই ততক্ষণ উনুন ধরিয়ে দুটো ভাত চড়িয়ে দে। মা কেমন আছে আজ?

ভাল না, রাত থেকে কাসিটা বেড়েছে।

থলিটা হাতে ঝুলিয়ে রেণু ফের ভিতরে ঢুকে —প্রকাশ ক্রন্দনপরায়ণ মেয়েটাকে দোলা দিয়ে চুপ করাবার চেষ্টা করতে লাগল। অনাহারে শুকিয়ে এসেছে প্রায়—তবু কি সুন্দর মেয়েটা যেন একটা আধ-ফোঁটা গোলাপ-কুঁড়ি।

ঘণ্টা দুই বাদে ওদের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে যেতেই প্রকাশ উঠে দাঁড়াল—আচ্ছা ভাই, আমি তা'হলে যাই—সর্ষের তেল যেটুকু দিয়ে গেলাম কাসি বাড়লে গরম করে মার বুকে মালিশ করে দিস্।

রেণু একটু ইতস্ততঃ করল, প্রকাশদা—আমাদের একটু থাকার বন্দোবস্ত করে দিতে পারবে অন্য কোথাও?

কেন রে?—হঠাৎ আবার কি হল?

হঠাৎ না, কিন্তু পাশেই ক্যাম্প হচ্ছে জানো না—কি করে থাকব আর?

তা বটে, হাত দশেক দূরে জঙ্গল কেটে একটা জায়গা প[illegible]র হতে দেখেছিল বটে। ক'দিন এদিকে না আসায় সেটা আ[illegible] মনেও ছিল না।

আচ্ছা আমি দেখব, ওখানে ঘর তোলা আরম্ভ হলেই খবর দিস্—বুঝলি। ততদিন শঙ্করকে বলে যাব, তোদের একটু দেখবে।

আচ্ছা।

ছোট্ট একটা মাটির প্রদীপ ধরে রেণু জঙ্গল থেকে বার করে দিতে এল ওদের। ক্ষীণ হয়ে জ্বলছে তার শিখা, আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশী—পোকামাকড়, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদের অকারণ উপদ্রবের ভয় থেকে রক্ষা করবার সম্বল বেচারীর ওইটুকু। তবু প্রকাশ না করতে পারল না। কুড়িয়ে পাওয়া বোনের স্নেহের দান এই কষ্টটুকু —তাকেও আঘাত দেবে কি করে?

তুই এবার ফিরে যা রেণু,—আমরা তো বড় রাস্তায় এসে গেছি।

আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি ভাই—তোমরা বেরিয়ে যাও—তোমরা চলে গেলেই আমি ফিরে যাব।

ঘন একটা বাঁশঝাড়—অনেকগুলো ডালপাতা মেলে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে, তারই নীচে দাঁড়াল রেণু, দু'হাতের মধ্যে প্রদীপটি ধরে—যেন বাতাসে না নিভে যায়। আলোর চাইতেও তার শঙ্কা-ব্যাকুল দৃষ্টিটুকু প্রকাশের বুকে এসে বিঁধছিল।

মেয়েটী কে রে প্রকাশ? ওদের পেলি কোথায়? সত্যেন প্রশ্ন করল।

সচকিত হয়ে উঠল প্রকাশ—ওদের কি করে পেলাম? পেলাম পথে কুড়িয়ে। কলকাতার বাসা উঠিয়ে তো চলে এলাম এখানে, ষ্টেশনে বেড়াতে যেতাম প্রায়ই—মণ্টুকে প্রায়ই দেখতাম ভিক্ষা করতে—একদিন ওর মার সঙ্গে আলাপ হল, তিনিও মধ্যে মধ্যে ভিক্ষা চেয়ে বেড়াতেন কিনা। ওরা বড় দুঃখী রে সত্যেন, এর আগে আমি ভাবতেও পারতাম না এত দুঃখ মানুষ সয় কি করে?

তা তোর ঘাড়ে চাপলো কি করে?

আমার ঘাড়ে আবার চাপবে কি? যতটুকু পারি দেখাশুনা করি এই মাত্র। সত্যেন, তুই বুঝতে পারবি কেন ওদের কথা? তোর

ঘরে অভাব নেই, সারাদিন পরিশ্রম করে মা বোনের পেটের খিদে মেটানো আর সন্ত্রম বাঁচিয়ে চলতে হয় না তোকে—কিন্তু আমার সবই আছে—অভাব, দুঃখ, বেদনা—এ আমাদের নিজস্ব জিনিষ।

রাত বেড়ে চলেছে, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত। রাস্তার ধারে মিউনিসিপ্যালিটির আলোগুলো জ্বলছে হয়তো টিপ্‌টিপ্‌ করে কিন্তু বাইরে মুখ দেখাতে পারছে না তারা—ব্ল্যাক-আউটের ঘোম্‌টা টানা। সরু পায়ে-চলা রাস্তা, দু'পাশে জঙ্গল কখনো পাত্‌লা হয়ে আসে কখনো হয়ে ওঠে ঘন। অন্ধকারে কাউকে পরিষ্কার করে দেখা যায় না, অস্পষ্ট দু'টো ছায়ার মত এগিয়ে আসছে দু'জন।

হঠাৎ প্রকাশ সত্যেনের একখানা হাত চেপে ধরল, সত্যেন—

কিছু বলবি ?

বলব, তার আগে একটা প্রশ্নের উত্তর দিবি ?

কি বলতে চাস স্পষ্ট করে বল প্রকাশ, আমি তোর কথা বুঝতে পারছি না।

দেশকে ভালবাসিস্‌ তুই ? সত্যি করে চাস্‌—আমাদের সব দুঃখদুর্দ্দশা দূর হোক্‌ ? অশিক্ষা, দারিদ্র্য, সংস্কার—সব কিছুর বন্ধন কাটিয়ে আমরা মানুষের জাতে পরিণত হই—একি তুই কামনা করিস্‌ ?

এ কে-না করে ভাই ?

জানতুম তবু সন্দেহ ছিল মুহূর্ত্তের জন্য প্রকাশের গলা কেঁপে উঠল,—তোকে আমার সম্পূর্ণ করে বিশ্বাস হত না, তবু মনে হয় জাতির নবজাগরণের দিনে—শক্তিসামর্থ্য নিয়ে তুই পিছিয়ে পড়তে চাস্‌নে, কর্ত্তব্য বলে যদি কোন কাজ তোর হাতে তুলে দিই—নিতে পারবি তার ভার ?

পারব,—কি দিতে চাস্?

রেণুকে তোর হাতে দিতে চাই—আবেগভরা গলায় প্রকাশ বলে চল্ল—বড় ভাল মেয়ে রেণু—বড় সুন্দর ওর মনটি, ভালবাসতে জানে আর জানে নিঃশব্দে নিজের কাজ করে যেতে। রূপ, অর্থ, আরও অনেক জিনিষ পেতে পারবি সত্যেন কিন্তু আমি বলছি ভাই এমন মন আর কোথাও পাবি না। ওকে যদি গ্রহণ করিস তোর মত সুখী বোধ হয় কেউ হবে না, বড় ভাল মেয়ে ও।

কিন্তু……

কিন্তু নেই এর মধ্যে। ওর অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে চাস্? বাবা মার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে মেয়েটি—ওর কর্ত্তব্যবোধ, ওর দুঃখের কাছে মাথা হেঁট করেনি—এইটে কি ওর যথার্থ পরিচয় নয়?

কিন্তু একি সম্ভব? আমার তো সমাজ, স্বজনের কাছে মাথা উঁচু করে চলতে হবে? তারা যখন চাইবে ওর, ওর কোলের মেয়েটির, ওর বাপ-মার পরিচয়—তখন কি বলব?

বলবি, আমাদেরই মত মানুষের মেয়ে ও—দুর্ভিক্ষের জন্য ওর জন্মদাতা ওকে বিক্রি করেছিল বিদেশীর হাতে—সমাজ, সংসার, ধর্ম্ম, দেশের মানুষ—কারু কাছে সাহায্য পায়নি বেচারী। সেই অসহায়তার পরিচয় কোলের ওই বাচ্চাটি—তবু ওর বৈশিষ্ট্য ও কারো কাছে মাথা হেঁট করেনি—কোলে করে বাঁচিয়ে রেখেছে শিশুটিকে।—সত্যেন, দেশের, সমাজের, মানুষের এত বড় কলঙ্কের চিহ্ন মুছে দেবার এত বড় সুযোগ আর কোথাও পাবি? ওকে বিয়ে করে ওর হারানো মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে তোর পৌরুষের পরিচয় দিবি সমাজের কাছে? সমাজ? সমাজ বলে কাকে তুই মানতে চাস্

বলত? তোর অর্থ আছে, পৌরুষ আছে, কাজ করবার শক্তি আছে, সমাজ গড়ে নেবার দায়িত্ব তো তোরই—।

প্রকাশটা একেবারে পাগল—তা না হলে এমন প্রস্তাব মুখে আনে? অন্ধকারেই হাসল সত্যেন। পাগল—এও কি সম্ভব?

কেন নয়?—যে অপরাধের কলঙ্কে আমাদের দুর্ভাগ্য দিন দিন ছাপিয়ে উঠছে আর সবাইয়ের সেটাকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করা কি এত-ই অসম্ভব?

তাই যদি হয়, তা'হলে তুই তো নিজেই বিয়ে করতে পারিস ওকে।

না পারিনা, আমার বন্ধন আছে, তোর নেই—ও দাদা বলে ডাকে, বড় ভায়ের মত ভক্তি করে আমাকে—আমার উপায় নেই সত্যেন—তুই—তুই করতে পারিস্ ওকে গ্রহণ।

সত্যেন হেসে উঠল খিল খিল করে, দমকা হাওয়ায় হঠাৎ কাঁপা শুকনো পাতার মত তার হাসি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল—নিজে নেবার যোগ্যতা নেই—তাই বন্ধুত্বের প্রলোভনে ভোলাতে চাস্ আমাকে? প্রকাশ—তোর হিষ্টিক্যাল ক্যারেকেটার হবার সম্ভাবনা আছে দেখছি। তোরই বা এত দুর্ভাবনা কেন, অনেক পথই তো ওর জন্য খোলা আছে।

চুপ! ফিস্ ফিস্ করে প্রায় গর্জ্জন করে উঠল প্রকাশ—আর একটিও কথা নয়। সত্যেন, তুমি আমার অতিথি সেকথা ভুলে যেতে দিও না, আজকের রাত্রি, কিন্তু কাল সকালে উঠেই তুমি রওনা হয়ে যেও—আমার ঘরে তোমার জায়গা আজ থেকে আর নেই।

একবাটি গরম জলের জন্য ওর আকুলতা দেখে দুঃখে ক্ষোভে কল্পনার বুক ফেটে যেতে লাগল কিন্তু বলবার পথ তার কোথায়। অক্ষম রোষে নিরপরাধা মেয়েটার উপরেই ফেটে পড়ল আর একবার—ক্ষিদে পেয়েছিল? অত ক্ষিদে পায় কেন রে তোর? খেতে পাসনে নাকি? কই আমার তো পায় না, বুলবুলির পায় না, মার পায় না—শুধু তোর পায় কেনরে? রাক্ষুসী কোথাকার!

মাসীমা রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়ালেন আর একবার—ক্ষিদের আর অপরাধ কি বাছা! আমরা কি আর খেতে দিই কিছু। ভাল খ্যাতিটা দিলি বাপু তোরা! আমরা খেতে দিই না—নারে অঞ্জলি?

ওরা কেউই উত্তর দিল না, ঝগড়া বাধিয়ে লাভ কি? একসময় হঠাৎ জবাব দিল বুলবুলি—বারে দিদিমণি, তুমি যেন কি! খেতে দিলে বুঝি আর ক্ষিদে পায় না? পিসিমণি তো রাত্তিরে খায়নি, রবিকাকু খেয়েছে—তবু সকাল বেলাই আবার তুমি লুচি খেতে দিলে আর আমাদের কিছু দিলে না, তা ক্ষিদে পাবে না? আমারও তো ক্ষিদে পেয়ে গেছে।

এক ফোঁটা বুলবুলির কথা যেন মাসীমার সারা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল—কি বললি? বলে তেড়ে আসতেই কল্পনা ওকে টেনে নিয়ে এনে পিঠের উপর এক চড় বসিয়ে দিল—তুই কেন কথা বলতে যাস্—বাচাল মেয়ে কোথাকার, চুপ করে থাকতে পারিস্‌নে?

বুলবুলির চীৎকার শুনে শোভা ছুটে এল,—ওকে মারছ কেন বলত দু'বোনে মিলে? ভাল হবে না বলছি ঠাকুরঝি আমার মেয়ের গায়ে হাত দিলে। শোভা মেয়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে গেল। তারও জ্বালা কম নয় এ বাড়ীতে বিয়ে হয়ে। একপাল পুষ্যির জ্বালায় নিজের ছেলেমেয়ে দুটোকে কোনদিন ভাল করে খেতে-

পরতে দিতে পারেনি, তার ওপর অন্যায় করে শাসন! এতো তার সইবে না। অসহ্য হয়—দিক্ তাকে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে, একমুঠো অন্ন তারাও দিতে পারবে। রোগে ওষুধ নেই, পথ্য নেই—ছেলেমেয়ে দু'টোর কি চেহারাই হ'য়েছে, দেখলে কান্না পায়, তার ওপর অসময়ে ধরে ঠেঙালে কি আর প্রাণে বাঁচবে ওরা? শোভা শ্বাশুড়ীর কাছে এসে অভিযোগ জানালো।

ঠক্ করে একখানা পোষ্টকার্ড ফেলে দিয়ে গেল রবি—বৌদি, তোমাদের একখানা চিঠি—কে যেন দিয়ে গেল। তোমাদের কে আসবে।

হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা তুলে পড়ে দেখল শোভা—ওমা, ছোট-কাকা আসছেন যে? কণ্ট্রোল থেকে কুইনাইন নেবেন, সেইজন্যে।

আগ্রহে মাও উঠে বসলেন,—তাই নাকি? দেখি চিঠিখানা, আজকেই তো আসছে সে। বউমা কাপড় ছেড়ে একবার রান্নাঘরে যাও তো মা—তার খাবার উদ্যোগ করে রাখ। এদ্দিনে যদি ছেলেটা মেয়েটার চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয় কিছু। ভুগে ভুগে হাড় ক'খানা তো বাকী আছে আর।

ছোট দেবরটির প্রতি এত বড় আশা পুষে রাখা মায়েদের আমলের লোকের পক্ষে মোটেই অসঙ্গত নয়। অল্প বয়সে শ্বশুরবাড়ীতে এসে ছোট ছোট দেওর ননদ ওরাই তো বালিকাবধূর মনে ভাইবোনদের অভাব আর পিতৃগৃহ ছেড়ে আসবার দুঃখটা ভুলিয়ে দেয়। তারও হয়েছে তাই, ছোট দেওরটিকে তিনি আপন সহোদর ভাইয়ের মতই ভালবাসতেন। শুধু তাই নয়—স্বামীর প্রথম রোজগারের টাকা খরচ করে, গায়ের গহনা বাঁধা দিয়ে, শীতের দিনে শুধু গায়ে আঁচল দিয়ে থেকে, পড়িয়েছেন তাকে। পড়াশুনায় তার বুদ্ধি বরাবরই একটু কম। দু'বছরের কমে এক ক্লাশের পড়া শেষ হত না, ডাক্তারীর চার বছরে

কোর্স শেষ করেছে দশ বছরে। আজও মনে পড়ে—বার বার অকৃতকার্য্যতার লজ্জায় মুখখানা ছোট করে এসে বলত—থাক্ বৌদি, আর নাই বা পড়লাম? দাদাকে বলে বরং একটা চাকরী-বাকরীতে ঢুকিয়ে দাও—আর কতদিন বসে বসে টাকার শ্রাদ্ধ করাবে আমায় দিয়ে?

স্বামীও হয়তো সেই কথায় সায় দিয়েছেন, কিন্তু বরাবর বাধা দিয়েছেন তিনিই—একটামাত্র দেওরের পড়া ছাড়াতে ইচ্ছা হত না তাঁর। ওর তরুণ সুকুমার মুখখানার দিকে তাকিয়ে মমতায় বুক ভরে যেতো। আহা, ছেলেমানুষ, করুক না আর একবার চেষ্টা। কি দরকার ওর সাত-সকালে সংসারের বোঝা ঘাড়ে করবার? স্বামীকেও বলতেন—একটা বছরের জন্য ছোটকার পড়াটা বন্ধ করে দিয়ে ক'টাকা আর বাঁচাবে বলো? পড়ুক না আর কিছুদিন—ডাক্তার হয়ে ঢের টাকা ও তোমাকে রোজগার করে দেবে। অসুখ-বিসুখে যখন পরের কাছে তোষামোদ করতে হবে না, তখন বুঝবে আমার কথার দাম।

তার সেই ছোটকা আজ পাশ করেছে, নিজের ডিস্পেনসারী খুলে বসেছে। আশে পাশে পসার বাড়ছে দিন দিন। বৌদির জন্যেও তার কি ভালোবাসাই না ছিল। মায়ের চোখ এড়িয়ে, রান্না-ঘরের আড়ালে ডেকে নিয়ে যেয়ে হাটের দিনে লুকিয়ে এনে দিত কত জিনিষ,—পাত আলতা, সেফ্‌টিপিন, চুলের কাঁটা, আমসত্ত্ব আরও কত কি।

একবার শাশুড়ীর পছন্দসই ঢাকাই কাঁসার একটা বাসন হারিয়ে ফেলেন তিনি—পাছে মায়ের বকুনী খেতে হয় সেই ভয়ে ছোটভাই তো চোদ্দ মাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে নিজের জমানো পয়সা দিয়ে চুপি চুপি বাটি কিনে এনে দিয়েছিল। সেই ছোটকা—তাঁর

কত আদরের ভাইটি। তারপরে কতদিন কেটে গেছে,—ছোটকা ডাক্তার হয়ে বসেছে, জমানো টাকায় সখ ক'রে ডিস্‌পেনসারীর ঘর তুলে দিয়েছেন তিনি,—অনেক খুঁজে মনের মত বউ এনে সংসার পেতে দিয়েছেন,—ছেলেমেয়ে নিয়ে আজ সেও এক সংসারের কর্ত্তা হয়ে বসেছে।

গোড়াতেই তাঁর ভুল হয়ে গেছে। এখানে না এসে যদি ওর কাছে যেতেন, তা'হলে কি আর এমন হয়—এতো কষ্ট সইতে হয়? এতো অসুখে ভুগতে হয় ওদের ?

ঠাকুমা দেখো কে এসেছে—বুলবুলি বাইরে থেকে ডাকলে। কে রে বুলু? কে, তোর ছোটদাদু নাকি ?—মা তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলেন। কোথায় ছোটকা? শীর্ণ, অকালে বুড়ো হয়ে যাওয়া একজন লোক বুলবুলির হাত ধরে এসে দাঁড়িয়েছে; কে এ?

মা সরে যাবার চেষ্টা করতেই কে তাঁর পায়ের কাছে মাথা নামালো—চিনতে পারছেন না বৌদি, আমি ছোটকা।

ছোটকা? অবাক বিস্ময়ে মা'র মুখ দিয়ে আর কথা বেরোল না, বলে কি এ? জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ একটা মানুষ···চঞ্চল, সবল স্বাস্থ্য, হাসি হাসি মুখ, সেই ছোটকা কোথায় গেলো? কেমন করে এও সম্ভব হোল ?

কি ভাবছেন বৌদি? কেমন করে এত বদলে গেলাম? ছোটকা বল্লো—ম্যালেরিয়াতে কি আর আছে কিছু শরীরে। এদের চেহারাই বা এমন হলো কি ক'রে? সেবার যখন আপনাদের ওখানে গেছলাম তখন দিব্যি চেহারা ছিলো। আর চেহারা —হতাশ ভাবে মা বল্লেন—সবই আমার কপাল! কি কাল যুদ্ধই যে বাধল ভাই, ধনে-প্রাণে গেলাম। প্রাণের দায়ে পালিয়ে এলাম এদেশে,

—আবার এখানে এসেও উল্টো বিপদ, ছেলেপুলেগুলো ভুগে মরছে। না ওষুধ, না পথ্যি,—কি যে হবে!

আপনার চেহারাও তো ভাল দেখাচ্ছে না,—আপনারও জ্বর হয় বুঝি?

শুধু কি আমার? যে ক'জন এসেছি সবারই; বুড়োটার শরীরে আর কিছু নেই,—এমনিতেই ও বরাবর রোগা। এবার তুই একটু দেখে-শুনে দে, তুই আসছিস্ শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

সে তো দেখবই বৌদি,—সে কি আর বলে দিতে হবে? তোরা কে কে ভুগছিস্, আয় তো এদিকে।

পিঁড়ি পেতে বারান্দার ওপর বসে গেলেন রোগ নির্ণয় করতে। বুড়ো, কল্পনা, অঞ্জলি, শোভা, মানু, টুলটুলি, খোকন,—সবাই সারি দিয়ে এসে দাঁড়ালো।

সবারই তো ম্যালেরিয়া বৌদি আর পেট ভর্ত্তি পিলে,—এর আর ওষুধ কি? ঠেসে কুইনাইন দিন।

কল্পনা বলে উঠলো—কুইনাইন্ তো পাওয়া যায় না ছোটকাকা। এক ডাক্তাররা কন্ট্রোলে যেটুকু পান, তা নেহাৎ দুঃস্থদের বিলি করে দেওয়া হয়,—কাজেই আমরা তো আর পাইনে,—পেলে কি আর এতো ভুগতুম?

সে কি রে? মোটেও কুইনাইন্ খাসনি তোরা? কেন, কলকাতা ছেড়ে আসবার সময়েও কিছু জোগাড় করে আনিস্ নি?

পেলাম কোথায়? আর যা করে এলাম যেন আজকেই মাথায় বোমা পড়ছে। বুড়োর যা ভয়—সহাস্য কটাক্ষ করলে কল্পনা বুড়োর দিকে—এখন কেমন লাগছে রে?

বুড়ো বেচারী লজ্জায় মুখই তুলতে পারছে না, অথচ বোকা বনে যাওয়াও তার স্বভাববিরুদ্ধ—যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর ভেবে কি হবে? এবার কাকার কাছ থেকে কুইনাইন আদায় করে জ্বর তাড়া সবাই—কাকা তো কণ্ট্রোলে কুইনাইন্ পান—এক ফাইল কিন্তু আমাদের দিয়ে যেতে হবে।

আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে এখন, আপাততঃ চানটান সেরে নিই, বড্ড ক্লান্ত, সারারাত ট্রেনে যা কষ্ট গেছে, আবার বেরোতেও হবে একবার; কইগো, বৌমা তেল দাও।

ফস্ করে গা থেকে জামাটা খুলে ফেলে হাড় ক'খানা অবশিষ্ট শরীরে ঠেসে ঠেসে তেল মাখতে বসলেন ভদ্রলোক। নিতান্ত অভাবগ্রস্ত দুঃস্থর মত চেহারা তাঁর অথচ বাবা বলেন এর যথেষ্ট রোজগার, বাড়ীর জমিজমার আয় হচ্ছে উপরি পাওনা। তবু চেহারা দেখে মনে হয় দীর্ঘকালের অনশনক্লিষ্ট, এর মানে কি?

পরদিনেই কাকার ধূমকেতুর মত হঠাৎ আবির্ভাবের কারণ জানা গেল, ভাইপো ভাইঝিদের প্রতি স্নেহ বা দাদা-বৌদির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি এখানে আসেন নি, প্রথম যৌবনের অনেক কমনীয় মনোবৃত্তি বিসর্জ্জন দিয়ে তিনি প্রৌঢ় বয়সে ঝুনো নারকেলে পরিণতি লাভ করেছেন। স্নেহ, মায়া, প্রভৃতি অর্থক্ষয়কারী নরম মনোভাব-গুলোকে অনেকদিন আগেই বিদায় দিয়ে বর্তমানে তিনি পরিণত মনুষ্যত্বে এসে উপস্থিত হয়েছেন, নইলে এই বয়সে ব্যাঙ্কে জমানো টাকার অংশ দিন দিন স্ফীতি লাভ করতে পারত না।

এখানে এসেছেন তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে কণ্ট্রোল রেটে জোগাড় করা প্রায় পাঁচশো ফাইল কুইনাইনের সদ্গতি করা। চড়া দামে ছাড়তে পারলে লাভ হবে মোটা রকমের

কারণ কুইনাইনের দর সোণার দামের চেয়েও উর্দ্ধগামী এবং সাপ্লাই নেই।

এখান থেকে সহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে আসা-যাওয়া চলে সাইকেলেই, দু'দিনের মধ্যেই মোটা টাকা নিয়ে তিনি বাড়ী ফিরলেন। এক একটা ফাইলের দাম একশো টাকারও অনেক বেশী। সময় সময় দু'শোর কাছাকাছি পর্য্যন্ত ওঠে। অবশ্য ছোটকাকার অত লোভ নেই, সস্তা দামে ছেড়ে লাভের অঙ্ক দাঁড় করালেন প্রায় সাতশোর কাছাকাছি। এর বেশী নেওয়াটা ঠিক উচিত হবে না, কাগজে অনেক লেখালেখি, অনেক আন্দোলন, অনেক কিছুর পরে গভর্ণমেণ্ট-এর হাত থেকে বার করে আনা কুইনাইনের এর চেয়ে বেশী সদ্গতি কি হতে পারত। যেখানে একবড়ি কুইনাইনের অভাবে—অনেক আশা করে, অনেক দুঃখ সয়ে মানুষ করে তোলা ছোটভাইটির সামনে বংশের দুলাল দিন দিন ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে, যেখানে ছেলের প্রাণ বাঁচাবার আশায় মা এসে ডাক্তারবাবুর পায়ে ধরে কেঁদে শিশিতে ভরা চিরেতার জল নিয়ে অমৃতজ্ঞানে ছেলের মুখে তুলে দিচ্ছে—সেখানে এর চেয়ে সদ্গতি কি আর হতে পারে ওষুধের? "লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়" অম্লান বদনে মোটা টাকার মুনাফা নিয়ে কাকা ফিরে গেলেন; ইচ্ছা করলে এক ফাইল না হোক্ এক শিশি ওষুধের মত কুইনাইনও দিয়ে যেতে পারতেন—কিন্তু সে ইচ্ছা হবে কেন? যাবার সময় অবশ্য খানকত প্রেসক্রপশান লিখে দিয়ে যেতে ভোলেন নি। সেগুলো হাতে করে মা নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলেন; এই তার পুরস্কার স্নেহের আর বিশ্বাসের! একে মানুষ করে তোলবার জন্য আঠারো বছরে স্বামী পড়াশুনা ছেড়েছেন, পনেরো টাকা মাইনেতে অফিসের ঘর-দুয়ার দিয়েছেন ঝাঁট আর তামিল করেছেন ওপরওয়ালা বাবুদের হুকুম।

নিজের হাতে রেঁধে খেয়েছেন আলুভাতে ভাত আর দশটি করে টাকা পাঠিয়েছেন প্রতিমাসে ভাইদের—ওরা মানুষ হবে, উকিল, হবে ডাক্তার, হবে ব্যবসায়ী, এত দুঃখ তাঁর সফল হয়ে উঠবে সেইদিন। পশ্চিমের হাড়-কাঁপানো শীতের রাত্রে কোঁচার খুঁটটি সম্বল করে—রান্নাঘরে উনানের পাশে ছালা পেতে শুয়ে কাটিয়েছেন রাত, আর কচি ছেলেকে কাঁদিয়ে রাত দুপুর পর্য্যন্ত দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি নিজের হাতে মেজেছেন বাসন, ভাত রেঁধে খাইয়েছেন সবাইকে, খুলে দিয়েছেন গায়ের গহনা, মুখ ফুটে কোনদিন জানান নি অভিযোগ। অসুখ হলে স্বামীস্ত্রীতে মিলে প্রাণপণে করেছেন সেবাযত্ন, টাকার দিকে চান নি কখনো। কিন্তু আজ? নিরুপায়, অসহায় হয়ে প্রত্যাশার দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন ওর দিকে—খুব প্রতিদান পেলেন। তবু কাউকে জানাবার উপায় নেই এ লাঞ্ছনা এ অবজ্ঞা আর অবহেলা—এতো তাঁর নিজের সৃষ্টি—নিজেরই লজ্জা! জানাবেন কাকে?

অনেকদিন তোমার খবর পাইনি, আমার খবর দেওয়াও এ চিঠির উদ্দেশ্য নয় জেনো। তোমাকে শুধু জানাতে লিখলাম—আমি ফিরে আসছি। কাল সকালবেলার ট্রেনে রওনা হচ্ছি; সন্ধ্যাবেলার দিকে ট্রেনটা পৌঁছবে—তুমি একটু ষ্টেশনে আসতে পারবে কি? একাই যখন যেতে পারছি, তখন বাকীটুকুও পারতাম কিন্তু জানো তো, অবলম্বন দেখলেই মেয়েরা দুর্ব্বল হয়ে পড়ে বেশী।

থার্ডক্লাশ কমপার্টমেন্টের একটা জানালা দখল করে বসল কল্পনা,—অনেক রাগারাগি করে অনেক কাণ্ড করে সে রওনা হ'য়েচে। বাবা মার অবাধ্য হবার ফল এখন থেকেই ভোগ করতে হচ্ছে তাকে, নিজের জমানো গোটা কত টাকা ছাড়া তার সঙ্গে আর কিছুই নেই। ভবিষ্যতের ভাবনা তো পরে ভাবলেও চলবে, আপাততঃ সে ভাবছিল, চিঠিটা ঠিক মত পৌঁছবে কিনা। যদি প্রকাশ না আসে তা হলেই বা কোথায় উঠবে রাত্রির মত? আত্মীয়তার গন্ধ আছে এমন কারো বাড়ীতে ওঠা চলবে না, কারণ তারা তাতে হবে বিরক্ত—তাকেও করতে হবে মাথা নীচু। তার চেয়ে কোন হোটেলে ওঠাও অনেক ভাল, কিন্তু জায়গা পাওয়া যাবে কি?

তুমি কোথায় যাচ্ছ ভাই? একটি মেয়ে প্রশ্ন করল। অন্য সময়ে এ রকম ভাবে আচমকা আপ্যায়িত হলে তার ভাল লাগত না কিন্তু উপস্থিত ভাবনার হাত থেকে রেহাই পেয়ে মন্দ লাগল না ওর।

আমি কলকাতায় যাচ্ছি। তুমি?

আমিও শ্বশুরবাড়ীতে যাচ্ছি কিনা—মিষ্টি করে একটু হাসল মেয়েটি—আমার বাবার ইচ্ছা ছিল না পাঠাবার কিন্তু ওর আবার রাখতে একটুও ইচ্ছা নেই, কি যে করি!

ও, আবার কে? তোমার স্বামী বুঝি? তোমাকে খুব ভালবাসেন—না? ঠাট্টা করে প্রশ্ন করল কল্পনা। মেয়েটা কিন্তু সরল, অত বুঝল না লজ্জিত ভাবে হাসল,—আমাকে ছেড়ে থাকতেই পারে না।

আর তুমি? তুমি পার তো?

আমিও না—ফিস্ ফিস্ করে মেয়েটী উত্তর দিল—সত্যি, বড্ড কষ্ট হয় ভাই কিন্তু কি করি, বাপের বাড়ী না এলে ওঁরাই বা কি ভাববেন।

তাও বটে—ভারী সমস্যা তো? তা ভাই—তোমার স্বামী কি করেন?

গর্ব্বিত স্বরে মেয়েটী বল্লে—চাকরী করেন ভাই, বড় দায়িত্ব ওদের। বোমা পড়লে কি সব খোঁজ-টোজ নিতে হয়—অতশত আমি জানিও না, বেটা ছেলের কথা—তবে বড্ড ভয় করে ভাই।

ভয় করে? কেন বলত?

অমন করে বোমার মধ্যে ছুটে যাওয়া, যদি কিছু হয়—একটা আপদ বিপদ।

কতদিন বিয়ে হয়েছে ভাই তোমার?

বিয়ে? তা দুবছর পুরতে চল্ল। ঠিক এই আমার বিয়ের আগেই তো চাকরী পেলে—তাতে সবাই বল্লে বউ ভারী পয়মন্ত, সম্বন্ধ হ'তে না হ'তে চাকরী।

তাই নাকি ? তোমার বুঝি অনেক আগে থাকতেই সম্বন্ধ হয়েছিল ?

হ্যাঁ ভাই আমার দিদির বাড়ীর পাশেই ওদের বাড়ী কিনা; জানলা থেকে দেখে ভারি পছন্দ হয়েছিল আমাকে, কিন্তু হ'লে কি হবে ? শাশুড়ী বড় রাস্‌ভারী লোক, দেনাপাওনা ঠিক করতেই এত দেরী হল।

কি দিতে হল তোমার বাবার ?

ছেলে হিসেবে বেশী লাগেনি ভাই, হাজার টাকা নগদ আর গয়না দিয়েছে—এই চুড়ি ক'গাছা, গলার দু'টো হার, কাণপাশা আর আম্‌লেট জোড়া। ভাল কাপড় দিয়েছেন বেণারসী একখানা, সিল্ক আর ঢাকাই, টাঙ্গাইল এই সব। তাছাড়া খাট-বিছানা, বাসন-পত্তর, আংটি, বোতাম, ঘড়ি, দানে যা দিতে হয় তাই।

পাওনার কথা শুনে কল্পনার তাক্‌ লেগে যাবারই কথা—বোমার চাকরী, অর্থাৎ কিনা অস্থায়ী এ. আর. পি-তে চাকরী করা একটা অর্দ্ধশিক্ষিত ছেলের হাতে এত খরচ করে মেয়ে দিতে পেরে বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন এমন কি মেয়ে পর্য্যন্ত আনন্দে গদ্‌ গদ্‌ হয়ে যায়। একবারও ওদের মনে পড়ে না ভবিষ্যতের কথা, মেয়ে হয়ে জন্মানো কি এত বড় অপরাধের কথা যে জলে ফেলে দিয়েও লোকে আনন্দ বোধ করে! মেয়েদেরও যদি একটু স্বাতন্ত্রবোধ থাকতো, একটু কম করে ভালবাসত রজত মূল্যে কেনা স্বামীদের, আত্মসম্মানের দিকে যদি একটু লক্ষ্য থাকতো—মানুষ হ'য়ে যেতো যে এদেশের ক্লীবগুলো।

তুমি কলকাতায় কার কাছে যাচ্ছ বললে না ভাই, মেয়েটি প্রশ্ন করল।

আমি—সহজভাবেই জবাব দিল কল্পনা—স্বামীর কাছে ভাই, অনেকদিন বাপের বাড়ীতে ছিলাম কিনা, তাই আর ভাল লাগছে না।

কার? তোমার?

শুধু আমার কেন? আমাদের সবারই।

তোমার স্বামীরও বুঝি? তা' তো হবারই কথা—তোমার স্বামী কি করেন ভাই?

কিছু না, রাতদিন ঘুমোন।

ওমা, সে কি গো? তোমাদের সংসার চলে কি করে তাহলে?

বোঝ ভাই আমার কি অবস্থা, আমার কাজই হোল, ঠেলে ঠেলে তাকে জাগাবার চেষ্টা করা—জাগাতে যদি পারতুম তাহলে কি আর এত কষ্ট হয়?

ঠিক বলেছ দিদি। পুরুষমানুষ অবুঝ হলে ভারী কষ্ট—আহা ভাই, তোমার বুঝি কিছুই গয়না নেই।

কি করে থাকবে বোন! স্বামীর থাকলেই তো তবে আমাদের গয়না। আমার স্বামীর সংসারে কি কোন শ্রী আছে?

তাও বটে, তা ভাই—তোমার হাতে শাঁখা নেই কেন? ওকি তুমি তো সিঁদুরও পরনি, দেখছি।

ইচ্ছে করেই পরিনে ভাই; স্বামীর মত স্বামী হত দশজনকে দেখাবার মত, তবেই না বিয়ের চিহ্ন হাতে মাথায় দিয়ে রাখব। ঘুমন্ত একটা আল্‌সে লোকের জন্য নিজের কপালে ছাপ আঁকতে নিজেরই লজ্জা করে।

কি জানি ভাই, তোমার কথা বুঝতে পারছি না আমি। মেয়েটি হাঁফ ছাড়লো—স্বামীর আবার ভালমন্দ কি? মেয়েমানুষের অত বিচার করতে নেই, গরীব বলে কি আর হেনেস্তা করতে হয়? এই দেখনা, মা দুর্গার স্বামীও ভিখারী—কৈ তিনি তো অমন করেন না।

কিন্তু ব্ল্যাক আউটের অন্ধকার, সাইরেনের বিভীষিকা আর ভীত সন্ত্রস্ত নরনারীদের অসহায় ভাব নিয়ে সহরটাও হয়ে উঠেছে থমথমে—মৃত্যু-উন্মুখ। একটা অদ্ভুত নীরবতায় ভরে গিয়েছে চারদিক, ঝড়ের পূর্ব্বক্ষণে আকাশে যেমন একটা ভাব দেখা দেয় ঠিক সেই রকম।

একি প্রকাশ, এ কোথায় এলুম ? ভুল করে অন্য কোন ষ্টেশনে নেমে পড়িনি তো ? এ কি কলকাতা ?

ছ'বছর যে ছিলে না রাণু ; এ পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝতে তোমার দেরি হবে না, সকাল হোক বুঝবে ?

কড়া নাড়তে লাগল প্রকাশ। অত্যন্ত সন্তর্পণে মিটমিটে একটা লণ্ঠন হাতে কে একজন এসে দরজা ফাঁক করে ধরল—কে প্রকাশ নাকি ? সঙ্গে কে ?

এসো রাণু—দরজায় খিল লাগিয়ে দিল প্রকাশ—এঁকে আনতেই তো ষ্টেশনে গিয়েছিলাম। খাওয়া-দাওয়ার কিছু ব্যবস্থা হোল ?

কি আর হবে ভাই—হতাশ ভাবে মাথায় হাত দিলেন তিনি—বড় মুস্কিলেই পড়েছি, বাসন ক'খানাও বেটা পালাবার আগে মেজে রেখে যায়নি। আর এই প্রকাণ্ড কয়লার চাঙ্গড়, ভাঙ্গা থাকলেও না হয় চেষ্টা করে দেখতাম। গ্লাস দুই জল খেয়েছি শুধু।

বিরক্তি আর চেপে রাখতে পারল না প্রকাশ—বেশ করেছেন, চাকর যদি দু'দিন না পাওয়া যায় তাহলে আপনারা খাবেন না আর ? এইটুকু কাজও করতে পারবেন না ?

ভদ্রলোক হঠাৎ জ্বলে উঠলেন, খুব তো লম্বা লম্বা বাৎ ঝাড়ছ ভাই, তা না হয় নিজেই করে দেখাও না ক্ষমতাটা ; তোমার মত আমার দেহে তো অসুরের মত জোর নেই। থাকলে কি আর কাউকে বলতে হত ? নিজেই ব্যবস্থা করে নিতুম অপরের উপর তম্বি না করে।

সেই ভাল, রাণু চলো তোমাকে আমার ঘরটা দেখিয়ে দিই, বসো একটু। আমি এদিকের সব ব্যবস্থা করে ফেলি।

তুমি আর কি ব্যবস্থা করবে? বরং আমায় দেখিয়ে দাও কোথায় কি আছে, আমিই ব্যবস্থা করে নিচ্ছি।

প্রকাশের আপত্তি টিঁকলো না; ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাসনপত্তর মেজে, ঘরদোর ঝেড়েমুছে, কল্পনা অনেকদিনের আবর্জ্জনা পরিস্কার করে নিজেও স্নান করে এল। এতরাত্রে আর বেশী গোলমাল না করে ডালে-চালে খিচুড়ী চড়িয়ে দিল।

মুখে যতই আপত্তি করুন, সকলেই পেট ভরে খেলেন, সকলের চেয়ে বেশী সেই ভদ্রলোকটি, কয়লা ভাঙ্গার অভাবে যিনি কোন ব্যবস্থা খুঁজে পাননি।

শোবার কি ব্যবস্থা হবে প্রকাশ? আমার তো ভীষণ ঘুম পেয়েছে।

কাল যা হয় একটা করা যাবে, আজকের মত তুমি আমার ঘরেই শোও, আমি বিজয়বাবুর ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে নেব।

বেশী তর্ক করবার মত অবস্থা ছিল না, সারাদিনের শ্রমে ওর ক্লান্তি বোধ হচ্ছে, হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল রাণু—কিছু মনে করো না প্রকাশ, ধন্যবাদটা কালকেই দেব, আজ আর পারছি না।

দুবছর প্রবাস-বাস হলেও এখানকার রুটিনমত কাজ করতে কল্পনার যে ভুল হয়নি, তারই প্রমাণ পাওয়া গেল ভোর বেলায়। এক ঘুমে কেটেছে সমস্ত রাতটা, আড়মোড়া ছেড়ে উঠে বসল কল্পনা। নাঃ গতদিনের ক্লান্তি আর নেই, শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে।

আস্তে দরজা খুলে ও বাইরে এলো, ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ, এখনো কারো ঘুম ভাঙ্গেনি ; ভোরের আলো ভাল ক'রে ফোটেনি, ওদের নিয়মে এখনও বিছানা ছেড়ে ওঠবার অনেক দেরী। নীচের কলটা খোলাই ছিল, জল পড়বার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

চৌবাচ্ছায় কলটা লাগিয়ে দিতে গিয়ে কল্পনা একেবারে স্নানটা সেরে নিল। দশটার মধ্যেই তো জল চলে যাবে। তার উপর এতগুলো লোকের তাড়া, তার মধ্যে ওর সুবিধে কি ক'রে হবে?

প্রকাশের যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন ওপর-নীচ ঝাঁট দিয়ে প্রকাশের ঘরটা পরিপাটি করে গুছিয়ে, ময়লা কাপড়-চোপড় কেচে রেলিংএর উপর মেলে দিতে দিতে আপন মনে গুণ্ গুণ্ করছে কল্পনা।

সুপ্রভাত রাণু, অনেক দিন পরে সহরের আলো-বাতাসের হ'য়ে আমিই তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সামনে এসে দাঁড়াল প্রকাশ।

সবুজ রংএর শাড়ীপরা, ভিজে চুলের গোছা এসে পড়েছে সামনে, অপরূপ দেখাচ্ছে ওকে। মৃদু হেসে উত্তর দিল—ধন্যবাদ, খুব খুশী হলাম শুনে।

অনেক কাজ করে ফেলেছ দেখছি। কখন করলে?

কেন, এই সকাল বেলা—তোমাদের মত আমি তো আর মোষের মত ঘুমোইনে, ঢের সময় পাই কাজের।

তাই নাকি? কি কি কাজ করলে বলতো?

বিশেষ আর কি, চোখ থাকলে আপনিই দেখতে পাবে, বেশী বলবার দরকার হবে না। তবে খাবার যোগাড় করে রেখেছি। উনুনে ভাত ফুটছে, মাছের ঝোল খেতে চাও তো বাজার করতে হবে, বুঝলে? তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলে দশটার আগেই ভাত পাবে।

থ্যাঙ্ক ইউ—বিদেশী কায়দায় মাথা ঝাঁকালো প্রকাশ। দু বছরে ঢের উন্নতি করে ফেলেছ দেখছি। ফার্ষ্টক্লাস গৃহিণী, অন্যের কথা নাই বা বললাম, আমারই তো লোভ হচ্ছে য্যাপ্লিকেশন পুট করতে। কি বল রাজী?

কল্পনা হেসে ফেল্ল,—করে দেখতে পারো; অদৃষ্টে থাকলে লেগেও যেতে পারে—সিউরিটী দিতে পারিনা তার জন্য।

পাশের ঘরে দরজা খোলবার শব্দ হোল। সদ্য ঘুমভাঙ্গা চোখে বিজয়বাবু বাহিরে এলেন। সকালবেলাই দুজনকে ঘনিষ্টভাবে আলাপ করতে দেখে মনে মনে বেশ বিরক্তি বোধ হল তাঁর। আজকালকার ছেলেমেয়েদের আর লজ্জা সরমের বালাই রইল না। ওদের সতর্ক করে দেবার জন্য একটু গলা খাঁকারিও দিলেন, কিন্তু সতর্ক হওয়া দূরে থাক্—ওরা দুজনেই হাসিমুখে ফিরে তাকালো।

সুখবর আছে বিজয়বাবু, আমাদের ভাত ফুটতে আরম্ভ করেছে আর তাগিদ এসেছে বাজারে যাবার জন্য; চট্ করে বেরিয়ে পড়ুন। প্রকাশ হেসে কল্পনার দিকে তাকাল।

এমন অবস্থায় সাধারণ মেয়েদের মত লজ্জা তো পেলই না কল্পনা, বরং উল্টে হেসে ফেল্ল—কাজ এগিয়ে রেখেছি, বাজারের

থলিও খুঁজে রেখেছি, ভাল করে খেতে চান তো মাছ আনবেন। আমি একবার রান্নাঘরটা ঘুরে আসি। চঞ্চল পায়ে সে নীচে নেমে গেল।

মেয়েটি কে প্রকাশ? আত্মীয় নাকি? সন্ধিৎসুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন বিজয়বাবু।

হ্যাঁ, আত্মীয়াও বলা যেতে পারে, তবে বন্ধু বললেই মানাবে ভাল, উনি আমার বন্ধু।

"বন্ধু" বিজয়বাবু একটু মুখ বিকৃতি করলেন।—তা ওঁর মা-বাপ কেউ নাই নাকি? এদ্দিন ছিলেন কোথায়? হঠাৎ এখানে যে?

হঠাৎ আসা দেখে বুঝতেই পারছেন দরকার ছিল। আর এতদিন যখন এখানে ছিলেন না তখন বুঝতেই হবে ছিলেন অন্য কোথাও। আর মা-বাপের খবর দিয়ে কি করবেন? দরকার বোধ করলে ঠিকানা দিতে পারি। এতগুলো অশিষ্ট প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল প্রকাশ।

বিরক্ত হচ্ছেন কেন মশাই? বিজয়বাবু লজ্জিত ভাবে বললেন, আমাদের আমলে তো এসব ছিল না। ভদ্রলোকের মেয়ে বলা নেই, কওয়া নেই, রাত্ দুপুরে ছেলেদের মেসে এসে উঠল, এটা দৃষ্টিকটু নয় কি?

দৃষ্টিকটু বলতে আপনি কি বোঝেন? একটি মেয়ে বিপদে পড়ে যদি চেনা-শোনা একটি ছেলের কাছে সাহায্যের আশায় এসে উপস্থিত হয়, তা হলে আপনি কি করবেন? দৃষ্টিকটু হয় বলে তখুনি রাস্তায় বের করে দেবেন একা? না যেখানে পাঁচজন ভদ্রলোক স্বজাতি থাকেন সেখানে পাঠাবেন?

এর উত্তরে বিজয়বাবু আর কিছু বলতে পারলেন না, তখনকার মত চুপ করে গেলেন বটে, তবে একেবারে চুপ করলেন না, মেসের অন্য সকলের কাছেই আনাগোনা করতে লাগলেন। ফলে মেসের সকলেই ওদের চরিত্রে তো সন্দিহান হলোই, এমন কি বাড়ীওয়ালা পর্যন্ত জানিয়ে গেল,—কি করি প্রকাশবাবু কিছু মনে করবেন না, জানেন তো বাড়ীভাড়া দিয়ে দিন চালাই, পাঁচজনের মনোমত হয়ে আমাদের চলতে হয়, এটা মেস্।

অপমানে, লজ্জায়, ক্ষোভে, প্রকাশের বাক্‌রোধ হয়ে এল। এরাই তার বন্ধু, তার স্বদেশবাসী, তার প্রতিদিনকার সঙ্গী? আর এই তার সুনামের পরিণাম, তার এতদিনকার কষ্টোপার্জ্জিত সুনাম আর সচ্চরিত্রতার মূল্য? কিন্তু রাগ করবে কার উপর? এদের? ছিঃ—

কিছু মনে করোনা রাণু, বুঝতেই তো পারছ সব। খাওয়া-দাওয়া সেরে কল্পনা সবেমাত্র এসে ঘরে বসেছে, ওর সামনে এসে দাঁড়াল প্রকাশ,—তোমার এখানে থাকা চলবে না আর।

বারে? কল্পনার চোখে অকৃত্রিম বিস্ময়; এখানে থাকবো বলেএসেছি নাকি? নেহাৎ কোথাও মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই বলেই দুদিনের জন্য এখানে এসে উঠেছি, নয়তো কি তুমি ভাবছিলে এখানে আস্তানা গেড়ে তোমাদের ঝি, রাঁধুনীর অভাব মেটাতে আর মুখ বদলাবার সুযোগ দিতে এসেছি?

না, অতটা ভাবিনি। কিন্তু তুমিও এতটা প্রস্তুত জানলে আর অনর্থক বলতে আসতুম না। যাক্ এখন বেরুতে পারবে কি একবার?

বেরোতে আর পারব না কেন? কোথায় যেতে হবে?

তোমাকে সেই স্কুলের চাকরীটার কথা বলেছিলুম না তার সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। যদি লেগে যায় বরাতে

তাহলে আজই জয়েন করবে। হোষ্টেলে থাকার ব্যবস্থাও করে আসব, তোমার একটা গতি করে দিয়ে তবে আমি মেসে ফিরব।

না করতে পারলে, ফিরবে না এই তো? কিন্তু তাতে তোমারই লোকসান বেশী। অনেক কষ্টে বাঁচিয়া রাখা চরিত্রটা তো গেছেই এবার তুমি শুদ্ধ লোপাট হয়ে যাবে। অনেকদিন পর কল্পনা প্রাণখুলে হাসল।

তৈরী হতে বেশী দেরি হল না। দুইজনেই বেরিয়ে পড়ল সেক্রেটারীর বাড়ী পার্কসার্কাস-এর ওধারে। ট্রামে করে পৌঁছিতে প্রায় তিনটে বেজে গেল।

এখন অসময়ে কি আর দেখা পাবে, না, আমার সদ্গতি করতে পারবে বলে ভাবছ? আমার তো একটুও ভরসা হচ্ছে না।

চলোই না, দেখা যাক। না হলে ফেরার রাস্তা ত পড়েই আছে।

বেশ, চল তা হলে।

সৌভাগ্যক্রমে ভদ্রলোক বাড়ীতেই ছিলেন। সামান্য কয়েকটা কথাবার্ত্তার পরে একেবারে য়্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটাও দিয়ে দিলেন। কালকেই জয়েন করতে হবে। ইচ্ছা করলে আজকে গিয়েই হোষ্টেলে উঠতে পারেন।

ওরা সম্মতি জানিয়ে উঠে এল। রাস্তায় এসে কল্পনা খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল—যাক্ এতদিনে তবু একটা গতি হোল আমার। মাসের শেষেই মাইনে পাব, একেই বলে সাবলম্বী।

কিসে তোমার এত ভাল লাগে, তাও বুঝতে পারছি না। এ চাকরিটা তুমি নেবে?

কেন নেব না বলতো? তুমি কি চাও, না খেয়ে শুকিয়ে মরি? আর তোমার মেসের লোকগুলোর আলোচনার জিনিষ হয়ে পড়ে থাকি ওখানে? এর চেয়ে বেশী ভদ্রস্থ আর হতে পারছি কিসে বলতো?

তা ঠিক কিন্তু সেক্রেটারী লোকটা…

ভদ্র নয়, এই বলতে চাও তো? কিন্তু মাইনে করা লোককে কে কোথায় সম্মান করে বলোতো? তুমি চাকরী কর না? জান না এসব? বরং অভদ্রতাই ভাল আমার পক্ষে।

তাতো বটেই, কিন্তু কিসে বুঝলে উনি ভদ্র নন্?

কিসে নয়? প্রথমতঃ ভদ্রলোক বসতে বলেন নি, তাছাড়া আমাকে যে অনুগ্রহ করে চাকরী দিচ্ছেন, গাদা করে রাখা য়্যাপ্লিকেশন উল্টিয়ে তারই প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু আর যাই হোক অনুরাগের পরিচয় তিনি কোথাও দেন নি। অনুরাগের চাইতে কি অভদ্রতা ভাল নয়। চাকরী যখন করতে হবে আর দুটোর মধ্যে একটা সইতেই হবে তখন অভদ্রতাটাই আমি বেছে নিলাম। তোমার আপত্তি আছে কি?

আমার আর এ অবস্থায় কি আপত্তি হতে পারে বল? কিন্তু নিজের দেশের মেয়েকে কি ওদুটো ছাড়া আর কিছুই দেবার নেই তাই ভাবছি।

যে দিন অন্য কিছু দেবার মতো হবে সেদিন আমাকেও মেস্ থেকে পালাতে হবে না এমন ক'রে। কাজেই এ চাকরী নেবার প্রশ্নই উঠবে না সেদিন—কি বল?

ঠিক, বেকার য়্যালাউন্সটা অন্ততঃ জুটবেই—প্রকাশ হেসে উঠল।

স্কুলের কাজ কল্পনার ভাল লেগেছে—এই কাজই তো সে চেয়েছিল, মানুষ গড়ার কাজ। এদের ভিতর থেকেই নূতন করে বেরিয়ে আসবে বাংলার যশস্বিনী মেয়েরা, তাদের পথ চিনিয়ে দেওয়াই হবে ওর ব্রত। এত সহজে এত সম্মানে আর কোথায় ওর দিন কাটত?

স্কুলটা খুব বেশী দিনের নয়। ছাত্রী সংখ্যা যা ছিল, যুদ্ধের গোলমালে বেশীর ভাগই গেছে চলে। যা আছে, তাদের নিয়ে কোন রকম চলছে বিদ্যাদানের কাজ।

শিক্ষয়িত্রীও বেশী নেই, হেড্‌মিষ্ট্রেস নেই—তারই জায়গাতে কাজ চালাচ্ছে আর একটি মেয়ে, প্রায় কল্পনারই সময়বয়সী—হাস্যমুখী, চট্‌পটে—প্রথম দর্শনেই ভাল লাগে তাকে।

এই নাও তোমার কাজ বুঝে—এইগুলো তোমার ক্লাস, বুঝেছ? এই ছোট বড় অপোগণ্ড আণবিকাদের মানুষ করে তোলবার কাজ রইল তোমার।

প্রথম পরিচয়েই অপরিচয়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে নিতে ওর বাধল না। কল্পনারও বেশ ভালই লাগল—খুব আস্তে ক'রে হাসল সেও।

কাজ আরম্ভ করে দেব নাকি?

দিতে পারো তো ভালই হয়—জয়ন্তী ওই মেয়েটির নাম, উত্তর দিল—টিচার নেই মোটে, আমরা ক'জন অনেক কষ্টে ম্যানেজ করছি ক্লাসগুলো। অসুবিধা হবে নাতো তোমার?

অসুবিধা? না, অসুবিধা কিসের? কাজ করবো বলেই তো এসেছি, তা হ'লে আরম্ভ করেই দেওয়া যাক্।

আচ্ছা, পাশের একটা বেঞ্চে বসে তিনচার জন মেয়ে বই খুলে রেখে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে এদিক ওদিক লক্ষ্য করছে, তাদের একজনকে ডাক দিল সে—আনন্দ, তোমাদের এখন কিসের ক্লাস?

আনন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বইয়ের পাতায় লেখা রুটিন বার করে দেখে, উত্তর দিল—হাইজিন, দিদিমণি।

হাইজিন? আচ্ছা, বেশ। পরে গলার স্বরটা একটু নিচু করে, —তুমি পড়াতে পারবে ত ভাই? কল্পনা ঘাড় নাড়তেই ফের আনন্দ নামে মেয়েটিকে ডেকে বল্লে—আনন্দ, এই নূতন দিদিমণিকে তোমাদের ক্লাসে নিয়ে যাও, ইনিই তোমাদের হাইজিন নেবেন।

কল্পনার পাত্‌লা গম্ভীর অথচ সতেজ চেহারা ওদের ভাল লেগেছিল। সকলে মিলে সাগ্রহে উঠে দাঁড়ালো—আসুন দিদিমণি।

পড়াতে পড়াতে আর এক মুস্কিল, স্কুলকপি বই নেই—ওদেরই একজনের বই নিয়ে যতটা সম্ভব সরল করে কল্পনা বুঝিয়ে দিতে লাগল। খুব বেশী কষ্ট হল না, কারণ ম্যাট্রিকে ওর নিজেরই হাইজিন ছিল এবং বরাবর ভাল থাকবার আগ্রহে পড়েও ছিল যত্ন করে।

টিফিনের আগে পর্য্যন্ত ওর আর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় হ'ল না, সমানভাবে পড়িয়ে যেতে লাগল—ইতিহাস, ভূগোল, ইংরিজি, বাংলা আরও কিছু—এক কথায় যা কিছু জানা এবং শোনা ছিল তার সব। একটা জিনিষ ওকে খুবই অবাক্ করে দিল—মেয়েরা অম্লান বদনে মুখস্থ বলে যেতে পারে বইয়ের পাতা থেকে কিন্তু ছোট্ট একটা প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারে না। এর মানে কি?

টিফিনের সময় শিক্ষয়ত্রীরা দল বেঁধে জটলা করছিলেন।

কল্পনাও এসে ওদের মধ্যে বসে পড়ল। কি খবর? কেমন লাগছে?—সদ্য পরিচিতা জয়ন্তী হেসে অনেক দিনের চেনা বন্ধুর মত প্রশ্ন করল।

দশটা থেকে একটা পর্য্যন্ত অবিশ্রাম বকে ওর ক্লান্তি লাগছিল ভয়ানক, কিন্তু সে কথা তো আর বলা যায় না। কল্পনা একটু হাসল—লাগছে এই এক রকম, তবে পড়াতে ভাল লাগে না, মেয়েগুলো অত্যন্ত বোকা।

আর অবাধ্য। শুধু তাই নয় সেক্রেটারী নিজেও অত্যন্ত পাজী, চল্লিশ টাকার জন্য এত পরিশ্রম পোষায় না—আর একজন টিপ্পনী কাটলেন।

কল্পনা সবিস্ময়ে ওর দিকে তাকালো,—চল্লিশ টাকা মানে? ষ্টার্টিং তো চল্লিশটাকায়, গ্রেড্ নেই এখানে? আপনি কত দিন আছেন?

আমি? তা—তিনবছর হতে চল্ল। আর এঁরা দেড় বছর থেকে সাত বছরের মধ্যে ঘোরাফেরা করছেন। গ্রেড্ বলে কিছু নেই এখানে। যাতে ঢুকবেন তাতেই চুল পাকাবেন।

তার মানে?

তার মানে? চল্লিশ টাকায় আপনার অনেক কষ্টে অর্জ্জন করা বিদ্যা আর স্বাস্থ্য এইখানে রেখে গিয়ে অনবরত পরিশ্রম আর অল্প আহার মিলে থাইসিস বাধাবেন এই আর কি!

সত্যি বলছেন?

দুদিন থাকলে নিজেই দেখতে পাবেন আমার কথার সত্যতা; অবাক হবার ঢের বাকী আছে এখনও।

টিফিনের পরের ক্লাস কটা কোনমতে শেষ করে টল্‌তে টল্‌তে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল কল্পনা। মাত্র চল্লিশটা টাকায় অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করে পা বাড়িয়েছে সংসার পথে, এর পরিসমাপ্তি কোথায় ?

অনেকদিনের অভিজ্ঞতার ফলে পুষ্পিতার পক্ষে ওর মনের কথা বুঝতে দেরী হল না একটুও। ইচ্ছে করেই আলাপ জমাতে এল।

শুয়ে পড়লে যে ভাই, বেড়াতে যাবে না ?

ক্লান্ত ভাবে কল্পনা উত্তর দিল,—নাঃ ভাল লাগছে না।

বাড়ীর জন্য মন কেমন করছে বুঝি ? কে আছেন তোমার ?

আছেন অনেকেই, কিন্তু সে কথা ভাবছি না—ভাবছি এখানকার কথা।

এখানকার কথা ? পুষ্পিতা হাসল। নূতন এসেছ কিনা, তাই খারাপ লাগছে। দুদিন যাক্, তখন বুঝতে পারবে যত খারাপ লাগছে ঠিক ততটা খারাপ এ নয়। মুষড়ে যাবার কথাও নয়।

ক্লান্তদৃষ্টিতে কল্পনা ওর মুখের দিকে তাকাল। পুষ্পিতা আপন মনেই বল্ল,—খুব ক্লান্তি লাগছে না কি ? কেন এত খাটতে গেলে ? চেয়ার টেবিল সাজিয়ে পড়াই বটে আমরা, কিন্তু তোমার মত নয়। যত পার ফাঁকি দেবে।

ফাঁকি দিলে বুঝতে পারবে না ? রাখবে কেন ?

ফাঁকি দেব জেনেই তো রেখেছে। যুদ্ধের বাজারে চল্লিশটা টাকায় যে ভদ্রভাবে টেঁকে থাকা সম্ভব নয়, এ আমরা যতটা জানি ওরাও জানে ঠিক ততটা, তবু রেখেছে একটা ঠাট্ বজায় রাখবার জন্য— পড়াবার জন্য নয় নিশ্চয়ই। কাজেই আমরাও প্রাণপণে ফাঁকি দিয়ে চলি।

তার মানে? সবাই কি ফাঁকি দেয় নাকি? এর কোন প্রতিকার নেই?

কিছু না। কি প্রতিকার থাকতে পারে বল? শিক্ষাদান মহৎ ব্রত স্বীকার করি, কিন্তু দান করবেন যাঁরা তাঁদেরও তো খেয়ে-দেয়ে বেঁচে থাকতে হবে, এ তুমি স্বীকার কর তো? তাদের যদি যোগ্যতার আর পরিশ্রমের উপযুক্ত মুল্য না দেওয়া হয় কতক্ষণ তুমি নিজের কর্ত্তব্য মানতে পার ভাই? সকলেরই সংসার আছে, অভাব আছে, দারিদ্র্য আছে, অসুখ আছে, প্রয়োজন বোধ আছে। শূন্যহাতে অভাবের সঙ্গে লড়াই কদিন চলে বল তো! তারপরে অন্নাভাবে আর অত্যধিক পরিশ্রমে অকালে ঘনিয়ে আসে জীবনের শেষদিন। শেষদিনেও কি শান্তি থাকে বেচারাদের মনে? বেচারা শিক্ষক—তার অভাব আর দারিদ্র্য দিয়ে যাত্রার সূচনা করে রেখে যায় শীর্ণ উত্তরাধিকারী—দুর্ব্বল লালনের ফলে দুর্ব্বলতম হয়ে বাধ্য হয়ে চলতে হবে যাকে। সুতরাং তুমি এখানে কি করবে ফাঁকি না দিয়ে?

মেয়েদের বোঝাবে কি বলে?

ওদের আবার বোঝাবার দরকার কি? গোড়া থেকেই এমন ভাবে তৈরী, যে চিরকাল নোট, মাষ্টার, এদের হাত ধরেই চলতে ওরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, নিজস্ব চিন্তার ছাপ কোথাও পাবে না। পুরুষানুক্রমে ওরা আমাদেরই সাহায্য নিয়ে কাটাবে। ফলে চল্লিশ হোক্ তিরিশ হোক্, আধপেটা খাবারের অভাব আমাদের হবেনা—আর আধখানা বিদ্যালাভেই ওদের অভিভাবকরা সন্তুষ্ট থাকবেন।

পুষ্পিতার কথাগুলো শুনতে ভাল না লাগলেও সেগুলো যে নিদারুণ সত্য তাও স্বীকার করতে হল দুদিন যেতে না যেতেই।

পুরো মাইনে পেলে কোনমতে টানাটানি করে খাওয়াটা-পরাটা চলে যায় কিন্তু নানান্ ছুতায় প্রায়ই মাইনে কাটা যাচ্ছে। লেট হলে ছুটি কাটা যায়। পড়ানো সম্বন্ধেও স্বাধীনতা নেই।

সেক্রেটারীর পাঠান নোট অনুসারে পড়াতে হয় তাকে। সময়ে অসময়ে সেক্রেটারী বাড়ীতে ডেকে পাঠান; না গিয়েও উপায় নেই কিন্তু যেতেও তার মাথা কাটা যায়। ভদ্রলোক বসতে তো বলেনই না বরং কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে এইটেই বুঝিয়ে দেন, যেন প্রয়োজন বোধ করলেই তিনি তাড়িয়ে দিতে পারেন। প্রকাশ যা বলেছিল মিথ্যা নয়, চাকরী বজায় রাখা অল্পদিনেই দুষ্কর হয়ে উঠল।

ক্লাসে পড়াতেও ক্লান্তি বোধ হয়; মেয়েগুলো এত বাধ্য যে প্রত্যেক কথাতেই ঘাড় নাড়ে, অথচ কাজের বেলায় একটু আঙ্গুল নাড়াতেও কষ্ট হয় ওদের।

ক্লাস এইট-এর ইতিহাস নিতে হয় ওকে। শেরসাহের উপর একটা চ্যাপ্টার আজ দুদিন ধরে কিছুতেই শেষ করতে পারছে না।

গীতা, পড়া শিখে এসেছ আজ?—ক্লাসের সেরা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল কল্পনা। গীতা উঠে দাঁড়াল,—শিখেছি দিদিমণি কোনখান থেকে বলবো?

কোনখান থেকে বলবে আবার কি? বলত—আকবরের শাসন ব্যবস্থার অনেকগুলিরই প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল শেরসাহের আমলে— এর উত্তর হবে কোথা থেকে?

বইটা একটু দেখে নিই, দিদিমনি?

বই দেখবে আবার কেন? পড়া শেখনি? তা হলে বল্লে কেন যে পড়া হয়েছে?

গীতা বেচারী মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। কল্পনা অন্যদের দিকে তাকাল—তোমরা কেউ বলতে পার? অনিমা, তুমি ?

চটপটে গোছের একটি মেয়ে উঠে দাঁড়াল—কি বলব দিদিমণি, আর একটিবার বলুন না।

আবার বলতে হবে ? কেন, যখন ওকে জিজ্ঞাসা করলাম তখন শোন নি ?

ভুলে গেছি দিদিমণি।

বেশ করেছ, তোমায় আর বলতে হবে না, কে শুনেছ বল দেখি। কেউই উত্তর দিল না। বিরক্ত ভাবে কল্পনা এর ওর দিকে তাকাতে লাগল, এমন সময় গীতাই ফের উঠে দাঁড়াল।

আমি বলব দিদিমণি ?

তুমি পারবে ? আচ্ছা বল।

শেরসাহের রাজ্যশাসন বললেই তো হবে দিদিমণি ? আর একটুও দেরী না করে সে উর্দ্ধশ্বাসে গড় গড় করে বলে যেতে লাগল, শেরসাহের বৃত্তান্ত। আগাগোড়া কমা, সেমিকোলন, ফুলষ্টপ সমস্ত নির্ভুল ভাবে আবৃত্তি করে গেল সে। চমৎকার তার স্মৃতিশক্তি—বইখানাকে খুব সুন্দর ভাবে মুখস্থ করে ফেলেছে।

বাঃ বেশ, মুখস্থ করা ভাল কিন্তু প্রশ্নের জবাব ত দিতে পারলে না। আমি বলেছি শেরসাহ নিজেই আকবরের আমলের ভাল ভাল নিয়ম কানুনের সৃষ্টি করেছিলেন রাজ্যশাসন করবার জন্য। একথার উত্তর কি হবে ? খুব সোজা করে সে আবার জিজ্ঞাসা করল।

আমার বইয়েতে তা তো নেই দিদিমণি। সেখানে লেখা আছে শেরসাহ। সেটাতো আমার মুখস্থ হয়ে গেছে কিন্তু এটাতো কোথাও পাইনি।

পাওনি? আচ্ছা। আকবর পড়েছ তো? পড়া আছে তোমার?—আছে? আচ্ছা ভাল। এখন শেরসাহ পড়ে এসেছ, দুজনের শাসন ব্যবস্থার তুলনা কর—তাহা হলেই পাবে আমার কথার জবাব।

হতাশ ভাবে মেয়েরা এ ওর দিকে তাকাতে লাগল। এ আবার কি? অনেকেই ত পড়িয়ে থাকেন কিন্তু এমন গোলমেলে কথা তো কেউ বলেন নি এর আগে। এখন কি করা যায়? কল্পনাও সমান হতাশভাবে তাদের দিকে চেয়ে রইল। কি করে শেখাবে ওদের? সহজ করে বলা বাংলাও যদি এরা না বোঝে, তা হলে কি উপায় হবে?

পরের দিন। টিফিনের সময় জয়ন্তী আর পুষ্পিতা ওকে ডাকল—শোনো তোমার নামে মস্ত কমপ্লেন আছে।

সেটা কার? তোমাদের নাকি?

তা হলে তো বেঁচেই যেতে। এই দেখ সেক্রেটারীর চিঠি, কৈফিয়ৎ চেয়েছেন তোমার পড়ানো মেয়েরা বুঝতে পারে না, ক্ষতি হচ্ছে তাদের। এদিকে ম্যানুয়াল এগিয়ে আসছে, গার্জিয়ানরা সব তাঁর কাছে অভিযোগ করেছেন।

খুব ভাল করেছেন। এভাবে মেয়েদের মাথা না খেয়ে স্বচ্ছন্দে মুখে পুরে চিবোতে পারতেন, তাতেই বরং কিছু লাভ থাকতো, কষ্ট আর অর্থ দুই-ই বাঁচতো। শোনো, ইতিহাস পড়া জিজ্ঞাসা করলে ওরা প্রথম থেকে শেষ অবধি মুখস্থ বলে যেতে পারে কিন্তু প্রশ্ন করলে উত্তর দূরে থাক্, বুঝতেই পারে না আমার কথা। বলত ওদের নিয়ে কি করতে পারি? কি করে শেখাই?

শেখাবার দরকার কি? ওদের মতো ওদের চলতে দাও, আমাদের মত আমরা চলি, এইটাই হচ্ছে চাকরী বজায় রাখবার একমাত্র উপায়,—আমি তো তোমায় আগেই বলেছিলাম।

কিন্তু ওরা যে কিছুই শিখছে না।

নাই শিখুক, এ যুগের ছাত্রছাত্রীকে ট্রেনিং দেওয়া চল্লিশ টাকায় হয় না। যা কিছু শেখবার তা ওরা নিজেরাই শিখবে। তোমার কাজ হচ্ছে যে কদিন টিঁকবে একটু আরাম করে থাকো। কেন ওদের ভাল করতে গিয়ে নিজের সুনাম হারাও?

জোচ্চুরী করে চাকরী বজায় রাখতে হবে?

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল পুষ্পিতা—ভুল হল ভাই, চাকরী বজায় রাখা তো শুধু নয়, বেঁচে থাকতে হবে প্রতিক্ষণ ধাপ্পা দিয়ে, তোষামোদ করে, অপমান সহ্য করে—আর এইটেই হচ্ছে টেঁকে থাকবার সহজ উপায় আমাদের পক্ষে।

ছুটির পরে, কল্পনা বিছানার উপর সোজা হয়ে শুয়ে পড়ল। দেখে পুষ্পিতা ওর কাছে এসে দাঁড়াল—শুয়ে পড়লে যে? যাবে না?

জিজ্ঞাসা ভরা চোখে কল্পনা প্রশ্ন করল—কোথায়?

প্রফুল্লদির বাড়ী যেতে চেয়েছিলে, চলো না; আমরাও যাচ্ছি।

ইচ্ছা করছে না আর, ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। বরং তুমি চেয়ারটাতে বসো একটু গল্প করা যাক্।

গল্প যেতে যেতেও করা যাবে আপাততঃ তুমি তো ওঠো।

পুষ্পিতা ওর হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল,—এই বয়সেই এত অলস হয়ে পড়লে চলবে কেন?

আর শুয়ে থাকা চলল না, কল্পনা উঠে পড়ল। প্রফুল্লদি এই স্কুলেরই আর একজন শিক্ষয়িত্রী—বেবী সেকসানের গোটা তিরিশ

ছাত্রীর ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক উন্নতির ভার এঁরই উপরে পড়েছে। ভদ্রমহিলা একাদিক্রমে সাত বছর কাজ করছেন এখানে। বয়স হবার গুণে ও সাত বছর অক্লান্তভাবে বিদ্যাদানের ফলে ছাত্রীরা সকলেই তাঁকে যমের মত ভয় করে চলে। মেজাজ অত্যন্ত খিট্‌খিটে—সচরাচর বালবিধবা মেয়েদের যা হয়ে থাকে।

স্কুলের খুব কাছেই তাঁর বাসা, অল্প পরেই ওরা এসে পৌঁছল সেখানে। কিন্তু হকচকিয়ে গেল স্বয়ং সেক্রেটারীকে ব'সে থাকতে দেখে।

তিনিই কিন্তু ওদের অভ্যর্থনা করে বসালেন,—আসুন, বেড়াতে এসেছিলেন বুঝি ?

কল্পনার মুখে কথা যোগাল না, ওর হয়ে পুষ্পিতা উত্তর দিল—না বসবো না, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম প্রফুল্লদিকে একবার দেখে যাই আজকে যান্‌নি কেন, অসুখ-বিসুখ হল নাকি ?

এতক্ষণে প্রফুল্লদি ওদের সামনে এসে দাঁড়ালেন, পরিস্কার একখানা ধুতি পরা, একটু লজ্জিত-লজ্জিত চেহারা।

হ্যাঁ, শরীরটা ভাল ছিল না বলে আর গেলাম না আজ। তা চলেছেন কোথায় ?

এই গঙ্গার ধারে একটু বেড়াতে ; চল্‌ কল্পনা, আবার ফিরতে দেরী হয়ে যাবে। আচ্ছা আসি ভাই প্রফুল্লদি—নমস্কার। ওরা দুজনেই বেরিয়ে এল।

এর মানে কি রে পুষ্প ? সেক্রেটারী এমন সময় ওঁর বাসায় ? আমার তো ধারণা ছিল, ভদ্রলোকের চরিত্র ভাল।

সে ধারণা ঠিকই, চরিত্র ভাল না থাকলে আর এতদিন টিঁকতে পারতুম না এখানে। তবে প্রফুল্লদির বাড়ী যাবার কারণ আছে।

প্রফুল্লদি ওর গুপ্তচরের কাজটা করে দেয়, আমাদের ফাঁকি দেবার কৌশলগুলি বলে দিয়ে।

তাতে ওঁর লাভ? কি আর এত মাইনে পান যে নিজেকে এতখানি ছোট করতে বাধে না ওঁর?

যা পায় তাই লাভ। সংসারটাকে অনাবৃত করে দেখতে এতদিন পাসনি বলেই তোর চোখে এসব এত বড় হয়ে উঠেছে। দুটো পয়সার জন্য মেয়েরা কি ভাবে নিজেদের বিলিয়ে দেয় বা দিতে বাধ্য হয়, এ জানা থাকলে এত বেশী করে আর এ সব চোখে পড়ত না। প্রফুল্লদির যা বিদ্যা তাতে অন্য কোথাও চাকরী পাবার ভরসা নেই। সুতরাং উঞ্ছবৃত্তি করে যা পাচ্ছে তাই ওর লাভ। আর চাকরী না করেই বা করবে কি? খেতে দেবার মত কেউ যে ওর নেই।

পরের দিন ভোরবেলা নিজের জিনিষ-পত্তর গুছিয়ে বিদায় নিল কল্পনা। এভাবে এখানে পড়ে থেকে নিজেকে ছোট করতে পারবে না সে, কপালে যাই থাক্। দুর্গতি যদি লেখা থাকেই ওর অদৃষ্টে, শেষ পর্য্যন্ত না দেখে তার হাতে ধরা দেবে না, এই ওর পণ।

পুষ্পিতা ঘুম থেকে উঠে অবাক হয়ে গেল—একি হচ্ছে? কোথায় চললি তুই এমন করে?

যেখানেই হোক্—যাচ্ছি কোথাও। এভাবে নিজের সম্মান নষ্ট করতে পারব না আমি। কোথাও পথ আছে কিনা আমাদের জন্য তাই জানতে যাচ্ছি—আর দেখা নাও হতে পারে। কল্পনা পা বাড়াল।

ক'দিনেই পুষ্পিতা ওকে ভালবেসেছিল—তার চোখে জল এল সে বাধা দিতে পারল না। তাদের তো আর আশা ভরসা বলে কিছু বাকী নেই। যদি পারে বিরূপ ভাগ্যকে জয় করতে

ওই পারবে। মাথা নোওয়াতে শেখেনি যে আজও, দুঃখ যাকে দুঃখ দিতে পারে না, স্বচ্ছলতা যাকে বাঁধতে পারে না, কঠিন ক'রে তাকে আর ও কি বলবে? নিজের মনেই ওর শুভ কামনা করল পুষ্পিতা।

দুর্গম পথের উপর দিয়ে যে যাত্রা, তাকে তুমি সার্থক কর ভগবান, ওর কপালে এঁকে দাও অমৃতের জয়টীকা। দুঃখ জয়ের সাধনাতে ওর সিদ্ধি হোক্। অপমানিতা, চিরবঞ্চিতা এদেশের মেয়েরা ওর প্রাণের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। নিজের পায়ে চলবার পথ খুঁজে পাক্—তারা; যুগযুগান্তর ধরে ব'য়ে আনা অবসাদের বোঝা নামিয়ে আবার তারা সবলভাবে সোজা হয়ে উঠুক—জীবন তাদের কাছে অমৃতে ভ'রে উঠুক্, আনন্দে ভরে উঠুক,—বেঁচে থাকার সম্পদ আর শ্রীতে ওদের প্রত্যেকটা দিন ঝল্‌মল্ ক'রে উঠুক।

সংকল্প যাই হোক্, আদর্শ যাই হোক্, স্বাধীনভাবে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকতে হ'লে আপাততঃ চাকরী একটা চাই-ই যেমন করে হোক্। যুদ্ধের মরশুমী ফুল ফুটছে ব্যবসাদারের ঘরে, চালের মণ চল্লিশ টাকা দরে ধ'রে! শান্তিপুর জরীপাড় শাড়ীর দামে বিক্রী হচ্ছে মোটা চটের মত খাটো মিলের শাড়ীগুলো। মাছের স্বাদ মনে পড়ে না, তরিতরকারীও অন্তর্ধ্যান করেছে এমন অবস্থা—ঠিক এই সময়টিতে নামল বর্ষা, ঘন বর্ষণে আকাশ আঁধার ক'রে।

ছাতা একটা কেনো প্রকাশ, দেখছো তো কত অসুবিধা। এসপ্ল্যানেড অবধি পৌছতে না পৌছতেই নামল বৃষ্টি—হল এণ্ড এণ্ডার্সনের বাড়ীর নীচে এসে দাঁড়াল দুজনে।

বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে, দুপাশের জানলাগুলো তুলে দিয়ে ট্রাম, বাস চলেছে ছুটে। এমন সময়ই তো ওদের বেপরোয়া হয়ে ছোটবার সময়, কারণ রাস্তার মোড়ে মোড়ে লোক দাঁড়িয়ে করছে না ওদের গতিরোধ। ভাড়াটে ট্যাক্সিগুলো ফস্ করে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ী বোঝাই বিদেশীদের নিয়ে—ওতে চড়বার শক্তি এদেশী মানুষের আর হবে না। স্বল্প পরিসর জায়গাটুকু—এরই মধ্যে লোকে ভরে গেছে—কল্পনা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। সার্ব্বজনীন নামের পরিবর্ত্তে 'সার্ব্বজাতিন্' নাম দিলে এখানটা বেশ মানানসই হোত—না আছে এমন জাত নেই। বাঙ্গালী, ইংরাজ, আমেরিকান, নিগ্রো, চীনা, গুর্খা, মাদ্রাজী, খোট্টা, সবাই মিলে চমৎকার একখানি একজিবিশন করে তুলেছে এই জায়গাটুকু।

প্রকাশ ওর অবাক হয়ে চেয়ে থাকাটুকু লক্ষ্য করল,—আমার ছাতা নেই বলেই এমন দৃশ্যটুকু দেখবার সুযোগ পেলে, থাকলে আর পেতে হোত না। সোজা ছাতা মাথায় দিয়ে ট্রামে উঠে পড়তাম।

তা বটে,—এদিক ওদিক তাকাতে লাগল কল্পনা।

কি করছ? এইটুকু জায়গার মধ্যে অত ছটফট করলে লোকে বিরক্ত হবে যে, সোজা হয়ে দাঁড়াও না।

তা, না হয় দাঁড়ালাম কিন্তু ওর কি হয়েছে বলত? কি করছে ও ওখানে—কল্পনা লক্ষ্য করল একটি মেয়েকে। শ্রীহীন, রুগ্ন দেহকে সাজিয়ে-গুছিয়ে জোর করেই বাইরে চলছে যেন, আর জোর করেই হাসাহাসি করছে বিদেশীদের সঙ্গে।—কি হয়েছে ওর?

বুঝতে পারছ না কি হয়েছে? পেটের দায়ে ও নেমে এসেছে অনেক দূর—তারই ছাপ ওর সারাগায়ে আঁকা।

আহা—কল্পনার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল, ওদের বাঁচিয়ে তোলবার কি কোন পথ নেই গো?

হয়ত আছে, হয়ত নেই, কিন্তু যেখানে সুস্থ সবল মানুষদের বেঁচে থাকবার সমস্যা এত প্রবল, সেখানে আবর্জ্জনার কথা কেউ ভাবতে পারে না।

কথা বলতে বলতে বৃষ্টি ছেড়ে এল, আলোয় ভরে উঠেছে সমস্ত আকাশ। চলো রাণু, এর পরে হয়ত আরও জোরে আসবে, তখন না পাবে দাঁড়াবার জায়গা, না পাবে বাসে জায়গা—এখন বরং একটু ফাঁকা পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

চলো—

ওরা দুজনেই ফুটপাত ছাড়িয়ে রাস্তা পার হয়ে এল। সশব্দে সার বেঁধে চলেছে ট্রাম, বাস, রিক্সা, ট্যাক্সি, কনভয় আরও কত কি। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে প্রায়, ব্লাক-আউটের রাত্রেও সুসজ্জিত নগরীর সারা গা থেকে আলোর জ্যোতি ঠিকরে বেরুচ্ছে। লম্বা, লম্বা পা ফেলে চলেছে সবল, সুস্থকায় নরনারীর দল। যৌবনের আনন্দ-স্রোতে ভেসে চলেছে যারা, তাদের আহ্বান জানাচ্ছে হোটেলে হোটেলে সুশ্রাব্য আনন্দের ধ্বনি—বাজনার রেশ এত দূর থেকেও ভেসে আসছে। ফারপোর বারান্দার ওপর দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট জনতার শ্রেণী, কাঁচের বাসন, কাঁটা চামচের ঐকতান, আসছে সুখাদ্যের গন্ধ। চল্লিশ টাকা মণ চাল, দু'টাকা সের আলু, কল্পনাতীত ভাবে বেড়ে যাওয়া মাছের দাম—শিয়ালদহ, মাণিকতলা, বউবাজার—সব যেন তাদের নিজের নিজের জায়গা ছেড়ে ছুটে এসেছে এইখানে। ভালভাবে আত্মপ্রাণ বিলিয়ে দেবার কল্পনা ওদেরও আছে তো? জীর্ণ, শীর্ণ, অকাল বার্দ্ধক্যে ভরা ঐ যারা সকাল না হ'তেই ছেঁড়া র‍্যাপারের আঁচল ঢাকা দিয়ে দু'আনা পয়সা বাঁচাবার জন্য দু'মাইল রাস্তা হেঁটে বাজারে এসে সবচেয়ে সস্তা তরকারী কেনবার জন্য দরদাম করে, আজকের সুযোগে তাদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে ওরাই বা কেন মুখ বদলাতে না চাইবে?

ট্রামে এসে উঠল দুজনে, জানালার ওপর একটা হাত রাখল কল্পনা, বাইরের অস্পষ্ট দৃশ্যটি ওর বড় ভাল লাগছিল। এমন সুশৃঙ্খল, এমন ছন্দ মিলিয়ে চলার দৃশ্য তারা যেখানে থাকে সেখানে বড় একটা দেখা যায় না। কি চমৎকার এদের স্বাস্থ্য, গর্ব্বিত চলার ভঙ্গী। সুন্দর করে সাজান ওদের আবেষ্টনী, ওদের মহল্লা।

মাগো—অস্ফুট কণ্ঠে প্রায় কেঁদে উঠল একজন—শির-ওঠা, হাড় বেরিয়ে আসা কুৎসিৎ একখানা লম্বা হাত মেলে। দুদিন কিছু খাইনি মা—দয়া করো মা, ভগবান তোমায় অনেক দেবেন।

অক্ষম দুর্ব্বল নিপীড়িত মানবাত্মার করুণ আর্ত্তনাদ ততোধিক করুণ প্রার্থনা—কে শুনবে ওদের কথা? ঈশ্বর বলে যদি কেউ থেকে থাকেন, কত শুনবেন তিনি আর? অক্ষমের হাতে নিজে তুলে দেবেন না তিনি, করেছেন বিরাট সৃষ্টি, দিয়েছেন প্রাচুর্য্য—সাহায্য করবেন তাদেরই যাদের হাতে অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে গড়ে উঠবে নূতনতম সৃষ্টি। অক্ষমের নিরুপায় দীর্ঘনিঃশ্বাস, তা শুনতে পাবার মত দিন আজও কি ফুরিয়ে যায়নি? আর একাই বা কত পারেন তিনি? নিজেরা চাইবে না বেঁচে থাকতে ভোগ করতে বড় হতে; পঙ্গুপ্রায় দেহ মনকে আরও পঙ্গু করে তুলেছে নানা বিধি নিষেধের বাঁধন দিয়ে—কামনাহীন নির্ব্বিকারত্বের আদর্শে গড়ে। দিন দিন অধোগতির সোপান বয়ে নেমে চলেছে নীচের দিকে তবু এদের চেতনা নেই, তাই ওদের কান্নায় আকাশ বাতাস ভরে গেলেও তিনি শুনতে পাবেন না, ওদের হতাশ্বাস প্রাণের প্রার্থনা অত দূর পৌছতে পারে না। পৃথিবীটা কাদের? বেঁচে থাকবার, সংগ্রামশীল নশ্বর সংসারে টিঁকে থাকবার—একমাত্র উপায় শক্তিমানের সাধনা, দেহে এবং মনেও। যুগে যুগে এদেশের মাটিতে নেমে এসেছেন ভগবান, শুনিয়ে গেছেন তাঁর বাণী, তবু ওরা শুনতে চায়নি, বুঝতে চায়নি বাঁধন খুলতে চায়নি। দেশ কি এদের? বসুন্ধরা যে বীর ভোগ্যা!

কিন্তু, দরিদ্র হোক্, দীনতম হোক্, দুঃস্থ হোক্—তবু ওরা কল্পনারই দেশের মানুষ, তারই প্রতিবেশী—এদেশের সুখ দুঃখ

ভাগ করে নেবার দায়িত্ব ওদের সঙ্গে তারই, কিন্তু তার নিজেরই বা কি আছে? এই ভিক্ষুকটির চাইতে ওর অবস্থাই বা ভাল কিসে? স্বচ্ছল দিনের পিতৃগৃহের অন্নে পরিপুষ্ট শরীর তার নিজের সাধ্যের সীমানায় এসে হাঁফিয়ে উঠেছে প্রতিমুহূর্ত্তে। ব্যাগ হাতড়িয়ে, অনেক খুঁজে, দু'পয়সা একটা বার করল কল্পনা। হাত বাড়িয়ে ভিখারিটার মেলে ধরা হাতের ওপর ফেলে দিল।

ভগবান তোমায় রাণী করুন মা,—খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে চলে গেল।

কত অল্পে সন্তুষ্ট দেখলে প্রকাশ?

এত অল্পে সন্তুষ্ট হয়েই তো এত দুর্গতি ওদের। বড় হবার, দুঃখ সইবার শক্তি ওরা হারিয়ে ফেলেচে এমন করেই—প্রকাশ বল্লে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্ল কল্পনা; কত আন্দোলন, কত দীর্ঘনিঃশ্বাস, কত পুঞ্জীভূত ব্যথায় ভরে আছে এদেশের বাতাস, কিন্তু পথ কোথায়? আজও সে কতদূর—আর কতদিনে এদের দুঃখ ঘুচবে ভগবান? আত্মবিস্মৃতির প্রায়শ্চিত্ত কি আজও শেষ হয়নি ঠাকুর?

নগর সাজাবার সামঞ্জস্যও কি অপরূপ! বিশাল শাল্মলী তরু, মাথা ছাড়িয়ে আড়াল করে আছে হাজারটা লতাগুল্মকে, শোষণ করে নিচ্ছে ওদের প্রাণরস। বিচিত্ররূপে ভরিয়ে তুলছে বনানীকে।

তারই মত আড়াল করে উঠেছে ওরা, শুষে নিচ্ছে এদের জীবনরসের গোপন উৎসকে; তারই আলেখ্য এঁকে চলেছে দেশের শাসনযন্ত্র, বিদেশীকে পরিপূর্ণ করে তোলবার আয়োজনে, বিভীষণের মত, মীরজাফরের মত, আত্মনাশকারী, স্বার্থপরতা-প্রিয়

ব্যবসাদারের হাতে, শাসকমণ্ডলীর হাতে, অধঃপতিত তরুণ সম্প্রদায়ের হাতে; বাঁচবার পথ নেই দেখে রসাতলের পথে এগিয়ে যাওয়া যাত্রীর দলে—বুভুক্ষু, নিরন্ন, প্রেতমূর্তি ভিখারীর দলে। এই তার দেশের সত্যকার রূপ।

সহরের উপকণ্ঠের কোন স্কুল থেকে ফিরছিল কল্পনা; সেখানকার স্কুলে ওর ইণ্টারভিউ ছিল, কাজটা কিন্তু হয়নি। লেডিস্ কম্পার্টমেণ্টের জানালার ধারে বসেছিল কল্পনা, মনে মনে আজকার ঘটনাগুলিই নাড়াচাড়া করছিল। নিজের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে ওর হাসিও পাচ্ছে বেশ।

ইণ্টারভিউ পেয়ে ওর আশা হয়েছিল এবার হয়ত কাজটা লেগেও যেতে পারে।

আপনি তো—টেবিলের ওপরে জমা ফাইলের স্তূপ উল্টাতে উল্টাতে সেক্রেটারী জিজ্ঞাসা করলেন—গ্রাজুয়েট? কি কি সাব্‌জেক্ট ছিল?

হিষ্ট্রী আর বেঙ্গলী—শঙ্কিতভাবে কল্পনা তার দিকে তাকাল, কিছু জিজ্ঞাসা করবে নাকি? তাহ্‌লেই তো হয়েছে, কিছু কি আর মনে আছে!

হিষ্ট্রি? কিন্তু আমাদের দরকার ম্যাথামেটিকস্‌এর টিচার, আপনি কি পারবেন?

বুকের মধ্যে কাঁপুনি ধরে গেছে ওর—নীচের দিকটা পারি, তবে ম্যাট্রিকে পারব না।

হুঁ, কিন্তু দরকার তো ওদেরই জন্যে, আপনি তাহলে কি নেবেন?

নেবেন? আশা তা হলে আছে এখনও? হিষ্ট্রী, বেঙ্গলী, হাইজীন, জিওগ্রাফী, ইংলিশ, তাছাড়া প্রাকটিক্যাল ক্লাস—যেমন সেলাইও নিতে পারি।

জিওগ্রাফী নেবেন? আপনি কি ট্রেইণ্ড?

না, ম্যাট্রিকে ছিল।

কিন্তু আজকাল অনেক বদলে গেছে।

খানিকটা নিঃস্তব্ধতা। তারপরে—ক্লাস ম্যানেজ করতে পারবেন? ইউ আর টু ইয়াং, মেয়েরা মানতে চাইবে কেন? বয়স কত আপনার?

মনে মনে হিসাব করল কল্পনা, নেহাৎ কম নয় একুশে পড়েছে। দু বছর রাখল হাতে, যদি অল্প বয়সটাই শেষে একটা খুঁৎ হয়ে পড়ে, —পঁচিশ হতে চল্ল।

দেখে তা মনে হয়না কিন্তু যখন বলছেন—মনে মনে ভাবলেন তিনি, মেয়েরা কোন দিনও বয়স কমায় ছাড়া বাড়াতে পারে না। বলছে যখন পঁচিশ, তখন বছর আটাশ হবে নিশ্চয়ই, রাখা যেতে পারে। অল্প বয়সের মেয়ে রাখলে দুমাসও টেঁকেনা তারা; অভাব বুঝতে শিখেছে এরা—সুতরাং থাকবে।

আপনাকে নেওয়া চলতে পারে আপাততঃ টেম্পোরারী হিসাবে —সেক্রেটারী বললেন। আপনার কাজের উপর আপনার পারমাম্মেণ্ট হওয়া নির্ভর করবে। ভাল, আপনারা কি জাত?

কথাটা ভাল বুঝল না সে। জাত? কেন আমরা হিন্দু—কাষ্ট হিন্দু।

ও, নো, নো, তা জিজ্ঞাসা করিনি, আপনি ব্রাহ্মণ না কায়স্থ তাই জিজ্ঞাসা করছি"।

কেন জানতে পারি কি? আমি কায়স্থ, দক্ষিন রাঢ়ী শ্রেণীর।

ও—সেক্রেটারী কিছুক্ষণ ভাবলেন কি যেন—আই এম্ সরি, কিছু মনে করবেন না, আমরা ব্রাহ্মণকে মানে বিশেষ বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণকেই ফাষ্ট প্রিফারেন্স দিয়ে থাকি সেজন্য—

সেজন্ম আমাকে জবাব দিতে হল? আচ্ছা নমস্কার—সোজা উঠে এল সে, ভদ্রলোকটি রাজী হলেও সে নিজেই এখানে কাজ করতে পারত না। বাঙালী, হিন্দু, শিক্ষিত, ভদ্র এঁরা—তবু এঁদের কি মনোবৃত্তি, ছিঃ।

ট্রেনে আসতে আসতে সেই কথাই তার মনে পড়ছিল—ভারতবর্ষ তো পরের কথা, ছোট্ট এতটুকু বাংলাদেশ কিন্তু বিশাল একান্নবর্ত্তী পরিবারের মতই এর অবস্থা। একসঙ্গে থাকা বিপুল সম্পত্তির ভাগ করা অংশ হয়ত একখানা ইঁটের মত, ভাগ করে নিয়েছে এর স্বজাতি-প্রেম পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে, তার পরে উচ্চবর্ণ ও অনুন্নত সম্প্রদায়ে। তা ছাড়া ব্রাহ্মণ আছে, কায়স্থ আছে, বৈশ্য আছে, এর উপর ধনী আছে, দরিদ্র আছে, অফিস আছে, চাকরী আছে, ব্যবসা আছে, হিন্দুমহাসভা আছে, লীগ আছে, পার্টি পলিটিক্স আছে—বিচিত্রবর্ণা, বৈচিত্রময়ী মাতৃভূমি—তোমার রূপের বিভিন্নতা ফুটে উঠেছে মনোবৃত্তির নানান্ অংশে তার সীমানা করবে কে?

ক্রমে অনেকগুলি ষ্টেশন ছাড়িয়ে এল। ল্যোকাল ট্রেনের ছুটে চলবার উপায় নেই, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলছে সে—আর তার দুপাশে চলেছে পড়ে থাকা জমি, অযত্নে বেড়ে ওঠা জঙ্গল, পানাভরা পচা ডোবা, মাঝে মাঝে দরিদ্র চাষীর দরিদ্রতম ভাঙ্গা ঘর। কাণাভাঙ্গা কলসী হাতে শীর্ণা বধূ চলেছে ঘোমটা টেনে, অল্প একটু ঘোমটা ফাঁক করে দেখে নিচ্ছে চলতি গাড়ীখানা। আসন্ন শীতের প্রলেপ লাগান রুক্ষমূর্ত্তি নগ্নতনু ছেলেমেয়ের দল। এরাই বাংলা দেশ—অন্নহীন বস্ত্রহীন, প্রাণ রসহীন, বাংলা দেশ! আবার তাকে দেখা যাচ্ছে সবুজ রংয়ের ঢেউ খেলান ধানের ক্ষেতে, সব্জীবাগানে, যেখানে সুপারীর খোলা জুড়ে জুড়ে লম্বা করে জল দিচ্ছে আলুর ক্ষেতে অক্লান্তকর্ম্মী

বাংলার চাষী। আর বোঝাই হয়ে বিদেশের প্রয়োজনে, এখানকার স্বর্ণ সম্পদ চলেছে দূরদেশে, তারই জয়রথের পথ আঁকা বাংলার বুকের পরে, লোহার রেল বসান আঁকা বাঁকা রাস্তায়,—এই তার বাংলা দেশ।

গাড়ী থামছে চলছে, লোকজন উঠছে নামছে। বসবার জায়গা নিয়ে ঝগড়া করছে মেয়েরা, বড় জোর আধঘণ্টার রাস্তা কিন্তু সেইটুকুর জন্য এতটুকু স্বার্থ ত্যাগ করতে রাজী নয় তারা। দু'এক ইঞ্চি বেশী দখল করবার জন্য স্বজাতীয়াদের সঙ্গে করছে কলহ। এক কোণে তিনজনের জায়গা জুড়ে বসে আছে একটা ফিরিঙ্গি মেয়ে—সকৌতুকে লক্ষ্য করেছে এদের কাণ্ডখানা।

"You are laughing, madam" রুক্ষকণ্ঠে কল্পনা বল্লে, They may be beasts to you, but worse are they who have no heart, who can enjoy at others' misery.

May be, but this scene is created by your country women. You see, you have lowered your own position before us.

মেম সাহেব ভ্রুকুঞ্চিত করে উত্তর দিল।

অত্যন্ত সত্যকথা, কিন্তু বিদেশিনীর মুখ থেকে সে কথা শোনবার দুর্ভাগ্য ওর সারাগায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর দিল কল্পনা—

But remember, you are one of them. Born in our country and living on our bread.

ফের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল ওর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে নিজেকে অকারণে আহত করে লাভ কি? বিদেশীর সামনে নিজেদের মর্যাদা বাঁচিয়ে রাখতে যারা জানে না, সম্মানের

চেতনা যাদের নেই, মুখের কথায় কি তাদের শিক্ষা দেওয়া যায় ?

গাড়ীতে ভিখারীর সংখ্যা রক্তবীজের মত ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও ট্রেন থামলেই ঠেলাঠেলি চেঁচামেচি করে উঠে আসছে, আবার মিনতিও জানাচ্ছে ওরই মধ্যে "ও মা, ও দিদি, ও মেমসাহেব।"

দেবার শক্তি তার নেই। বাঁচবার আগ্রহ না থাকলে একদিন তাকেই যেয়ে ওদের মাঝখানে দল জুটিয়ে নিতে হত। অনেক কষ্টে ফুটপাথের পরিবর্ত্তে সে উঠে এসেছে খোলার বস্তিতে। অন্ধকার, স্যাঁৎ সেঁতে একটা ঘরে কিন্তু অবস্থা তো দুপক্ষেরই সমান।

স্টেশনে প্রকাশ আসবে বলেছিল, ট্রেন থেকে গলা বাড়িয়ে কিছুই দেখা যায় না, যা ভীড়। বাইরে যেয়ে অপেক্ষা করলেও চলবে। কল্পনা নেমে পড়ল, তার সঙ্গে নামল আরও অনেকগুলো মেয়ে—বেলঘরিয়া সোদপুর এইসব যায়গা থেকে এসেছে কণ্ট্রোলের চাল নিতে। পরনের অত্যন্ত ছেঁড়া এবং মোটা কাপড়গুলোর জন্মের ইতিহাস বোধ হয় ঐতিহাসিক টডেরও জানা নেই। জীর্ণ শীর্ণ উদ্‌ভ্রান্তের মত চেহারা, রুক্ষ চুলগুলি ধূলি ধূসরিত, মানুষ না বলে জন্তু বলাও চলে এদের—সর্ব্বাঙ্গভরে ফুটে উঠেছে ক্ষুধার অকরুণ চিহ্ন, মনুষ্যত্বের রেখা কোথাও দেখা যায় না।

এটা কি শিয়ালদা ? ওদের দল থেকে একজন জিজ্ঞাসা করল—কন্‌ট্রোল কতদূরে দিদি ?

কণ্ট্রোল কোথায় আমি তো জানি না বাছা। তোমরা কি সেখানে যাবে ? তোমরা চেন না কোথায় চাল দেওয়া হয় ?

কোনদিন তো আসি নি চিনব কি করে? কলকাতায় চাল দেওয়া হয় শুনেই তো সরি বল্লে, চল মা ওখানে গেলে হয়ত দুটো পাওয়া যাবে—তাই আলাম।

কিন্তু এ বেলা তো দেওয়া হয় না, সেই সকাল বেলা। তোমরা এখন এলে কেন?

ওই জন্যি তো আলাম। আজকে না দাঁড়ালে কাল সকালে চাল পাব কেন? কত লম্বা লাইন হয়ে যাবে পিছনে পড়লি কি আর চাল পাব?

আহা তবে তোমরা খাবে কখন? বাড়ী ফিরবেই বা কখন?

তা ভগবানই জানে, পোড়া পেটের জন্যি কত জ্বালাই যে কপালে ছিল।

সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্ল। হয়ত একদিন এও ছিল ভদ্রঘরের মেয়ে, ভদ্রঘরের বউ, হয়েছিল অনেকগুলি ছেলেমেয়ের মা, পেতেছিল সুখের সংসার কিন্তু কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে আজ? এর শেষ কোথায়?

বিফল-ওয়াল তুলে বিপদ কতটা কমেছে তাও রীতিমত গবেষণা করে দেখবার দরকার। অনেক কষ্টে অনেক ঠেলা ঠেলি খেয়ে, অনেকের হাত এড়িয়ে, বিফল-ওয়ালের ধাক্কা খেতে খেতে কল্পনা বাইরে বেরিয়ে এল। সামনেই ছিল একটা মাল নেবার ঠেলা গাড়ী, তাতে পা বেধে যেতেই ছিটকে পড়ল সে।

আহা—হা অনেকেই বলে উঠলেন।

লেগেছিল বেশ কিন্তু এদের দরদভরা সহানুভূতির হাত এড়াবার জন্য ও নিজেই উঠে দাঁড়াল। এতগুলো মানুষ বেরিয়ে আসছে, কিন্তু একটা সিষ্টেম নেই এদের, অনর্থক ঠেলাঠেলি চেঁচামেচি করা ছাড়াও যে সহজভাবে বেরিয়ে আশা যায় এ কথা কে বুঝবে?

আরও একটু এগিয়ে আসতেই বাধা পড়ল। সামনে শুয়ে একজন মুমূর্ষু ভিখারী, পরনে শুধু একখানা নেংটি ছাড়া আর কিছু নেই। শীর্ণ, কঙ্কালসার চেহারা, মন্বন্তর রাক্ষসীর বলি। শেষ হয়ে যাবার আর দেরী নেই, আপন বলতেও কেউ নেই মৃত্যুশয্যার পাশে। স্বজন তো নেই-ই, আত্মীয়ও নেই। ঠোঁট দুটো একটু একটু নড়ছে। থমকে দাঁড়াল কল্পনা। শেষ নিঃশ্বাসেও বেচারী চাইছে একটু জল—একটু তৃষ্ণার শান্তি। ভগবানের নাম নেই, প্রিয়জনের ধরে রাখবার চেষ্টা নেই—সৃষ্টির নিয়ম আজ নিদারুণ ভাবে হেরে গেল! চলে যেতেও পা বাধছে, ওকে একটু জল দেওয়া দরকার—কিন্তু কোথায় পাবে জল? ষ্টেশনের বাইরে আশেপাশে কোথাও টিউবওয়েল থাকতে পারে, কিন্তু খুঁজে বার করে জল আনতে অনেকক্ষণ দেরী লাগবে, ততক্ষণ ও বাঁচবে কি?

চায়ের দোকানে একটু জল চাইল কল্পনা। জল তো আমরা বিক্রি করি না, চা খাবেন? চা?

অনেক কষ্টে পয়সা দিয়ে মাটির ভাঁড়ে করে কল্পনা জল নিয়ে এল, ততক্ষণ তার জলের প্রয়োজন গেছে ফুরিয়ে, মরুভূমির মত তৃষ্ণা নিয়ে ও চলে গেল।

বাসে উঠতে গিয়ে আর এক বিপদ। ফুটপাথের উপরে অনেক টাকা খরচ করে তোলা দেওয়ালগুলোর গা ঘেঁসে অনেকগুলো ভিখারী সংসার পেতে বসেছিল। ছোটবড় তফাৎ বোঝা যায়না ওদের মধ্যে। সকলেরই নগ্নপ্রায় শুকনো কঙ্কালসার মূর্ত্তি। কতকগুলো ছোট ছেলে, চামড়া-ঢাকা হাড় কখানি, বাটী হাতে সমান ভাবে দয়া ভিক্ষা করে চলেছে—বাবুগো একটি পয়সা, বাবুগো খেতে দাও, মাগো কিছু দাও।

জাত ভিখারী আছে ওদের মধ্যে। দুর্ভিক্ষের তৈরী করা ভিখারীও আছে, কথার সুরে আর তফাৎ বোঝা যায় না কিছু।

রাস্তা ডিঙ্গিয়ে সামনেই একটা হোটেল, দড়িতে বাঁধা মাংসখণ্ড আর প্লেটের উপর সাজান খাবার তার জীবন্ত বিজ্ঞাপন। বারান্দার কোল বেয়ে নর্দ্দমা দিয়ে গড়িয়ে আসছে ফ্যান—মাটির দুটো ভাঁড় হাতে করে দুজন মেয়ে এগিয়ে গেল সেইদিকে, যদি কিছু মেলে।

দেওয়াল ঘেঁসে শুয়েছিল আর একজন, শীর্ণ তনু হতে যৌবন এবং নারীজনোচিত লাবণ্য অনেকদিন আগেই শুকিয়ে গেছে, উঠতে গেলে হাঁফাচ্ছে, তবু বুকের শেষ রক্তটুকু টেনে নিতে দিয়েছে কাঠির মত রোগা একটা ছেলেকে। তারই পাশে শুকনো চোখে বসে আরও দুটো ছেলেমেয়ে, পরনে তাদের একটুকরাও ন্যাকড়া নেই, ফ্যাল ফ্যাল ভাবে তাকাচ্ছে পথ চলতি মানুষের পানে—ভিক্ষা চাইবার শক্তিও বোধ হয় আর নেই। হঠাৎ মেয়েটার নজর ওদিকে পড়তেই শুকনো চোখ লোভার্ত্ত হয়ে উঠল, আগ্রহে জোর করে উঠে দাঁড়াল সে—ওইরে হোটেলের ফ্যান ফেলছে। বুদো চলতো দেখি যদি কিছু পাওয়া যায়।

ভাইটার হাত ধরে ওদিকে বুদো এগিয়ে এল। ওদের হাতে একটা মাটির ভাঁড় পর্য্যন্ত নেই, লোলুপ দৃষ্টিতে বুদো মেয়ে দুটি ভরা ভাঁড়টার দিকে চাইল। অন্য ছেলেটি অত বোকা নয়, তাড়াতাড়ি জিব দিয়ে চাটতে আরম্ভ করে দিল নর্দ্দমাটা। তাড়াতাড়ি কল্পনা চোখ ফিরিয়ে নিল, উঃ সভ্যজগতের সেরা সৃষ্টি এই মানুষ, কি পরিণতি হল আবার তারই!

এগিয়ে যেতে কল্পনার পায়ে লেগে কেঁদে উঠল একটা ছোট্ট ছেলে। আশেপাশে কেউ নেই, কালো রোগা মত মাস ছয়েকের একটা ছেলে। ওর মা বোধ হয় ওকে নামিয়ে রেখে গেছে কোথাও।

কার ছেলে এ? তোমাদের? আশেপাশের নিরন্ন জনতাকে প্রশ্ন করল কল্পনা।

না মা, ওতো সেই দুপুর থেকেই পড়ে আছে ওখানে, বোধ হয় ওর মা ওকে ফেলে গেছে। কেউ তো আসেনি মা ওর খোঁজ করতে।

বত্রিশ নাড়ীর বাঁধনে বাঁধা, বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করা সন্তান, কি দুঃখে ফেলে গেল অভাগী মা! মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল কল্পনা, হাত বাড়িয়ে ধরে ফেল্ল প্রকাশ,—কি হল রানু? কি হল? শরীর খারাপ লাগছে?

না—ততক্ষণে নিজকে সামলে নিয়েছে কল্পনা—না আমার কিছু হয়নি, কিন্তু ওর কি হবে?

কার? এই ছেলেটির? লক্ষ লক্ষ নিরন্নের বুকফাটা মানিকের যা হবার তাই হবে।

মরে যাবে? কল্পনার চোখের জল বাধা মানল না—আহা মরে যাবে! কেন? কেন প্রকাশ, ওকে বাঁচাবার কেউ নেই? ওর দেশের খাবার, সোনার বাংলার সোনার ধান জাহাজ ভরে চলে যাচ্ছে বিদেশের ক্ষুধা মেটাতে আর এতটুকু একটু ছেলের মুখে পৌছবে না তার একটা কণাও?

এই তো আমাদের নিয়তি, কি করবে বল? কি করতে পার ওর উপায়?

আমি নিয়ে যাই, আমি ওকে মানুষ করে তুলব।

পাগল তুমি নিয়ে ওকে কি খেতে দেবে? নিজেরই খাবার সংস্থান নেই, তার উপর কুমারী মেয়ে তোমার কোলে এতটুকু শিশু দেখলে আমাদের দেশে তোমার বাঁচার সম্ভাবনা যাবে

দূর হয়ে। ওকে বাঁচাতে তো পারবেই না, মাঝের থেকে তুমিও মরবে। কি করবে ওকে নিয়ে?

তাহলে চল অনাথ-আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে আসি।

তারাও নেবে না! তুমি আমি গেলে সন্দেহ করবে অন্য কিছু—ডাকবে পুলিস, বিশ্বাস করবে না আমাদের কথা, আর নয়ত চাইবে মোটা টাকার ঘুস। ম্লান হাসল প্রকাশ,—উপায় নেই, ওকে যেতে দাও। তোমার আমার চেষ্টায় ওকে বাঁচাতে পারব না। নিজেরাও মরব জড়িয়ে। তার চেয়ে চলে এসো, আজ শুধু দেখে যাও, যদি কোনদিন সময় হয় এর প্রতিকার করবার চেষ্টা করো। মানুষ করবার চেষ্টা করো এদেশের লোককে। তোমার মধ্যেও বাঁচবার যেটুকু সম্ভাবনা আছে এমন করে নষ্ট করোনা তাকে, ডেকে এনোনা তোমার অপমৃত্যু।

জানালার কাছে দাঁড়ালেই পাশের বস্তিটার আগাগোড়া দেখা যায়। বস্তিজীবনের চেহারাও যাচ্ছে দিন দিন বদলিয়ে, চিরকালই রোগা ওরা, তবু আগে ওরই মধ্যে একটু তৈল-চিক্কন চেহারা দেখা যেত, অল্পপত্রে ভরা নিমগাছে হঠাৎ বসন্ত আসবার মত। দিনমজুরী করে, অল্পপয়সার তাড়ি খেয়ে, গান গেয়ে, বাজিয়ে, বউকে ধরে ঠেঙ্গিয়ে বেশ আনন্দের সঙ্গেই থাকত ওরা। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ছাড়াও আনন্দের খোরাক ছিল আরও অনেক। টানাটানি করে দু'একটা বারোয়ারী পূজা করে, ফাগুয়ার উৎসবে মাতামাতি করে, কাঁটা ঝোপে ভরা আগাছার জঙ্গলের মত ওরাও বেশ নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছিল।

আজকাল বস্তির রূপ বদলে গেছে। বাড়ীওয়ালী নিস্তার হয়ে উঠেছে বড়লোক—রঙ্গিন জরীপাড়, শান্তিপুরী শাড়ী পরে পান খেয়ে রসে রাঙা টুকটুকে ঠোঁটে মিষ্টি হেসে এ বাড়ী ও বাড়ী করে বেড়ায় সে। লেখাপড়া জানবার গুণে কল্পনাকে বরং একটু খাতির করে চলে, সময়ে অসময়ে কুশল প্রশ্নও করে, জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে চিঠিও দুই একটা পড়িয়ে নেয়।

অকৃতজ্ঞও সে নয়—টাটকা ফলটলও মাঝে মাঝে সে ভেট দিতে চায়, সস্তাদামে দিতে চায় ভালজাতের চাল, শাড়ী; দোষনীয় কিছু নেই কোথায় যেন তবু বাধে, কল্পনা নিতে চায়না। তবু নিস্তার সাধাসাধি করে।

সেজেগুজে কোথায় চলেছে যেন। ওপরের দিকে নজর পড়তেই হেসে ফেল্ল—কি হচ্ছে গো দিদি?

কল্পনাও হাসল—এই দেখছি তোমার ঘরবাড়ী আর ভাড়াটেদের।

ওপর থেকে আর কতটুকু দেখা যায় দিদি, নেমেই এসোনা একদিন। কল্পনার ভাল লাগল না এই অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা। তাছাড়া প্রকাশ বারণ করে দিয়েছে।

সময়ই পাইনা যাবার, তাছাড়া এখান থেকেই তো বেশ দেখা যায়, তা এত সকালে চলেছ কোথায়?

যাই দিদি পেটের ধান্ধায়—নিস্তার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে উত্তর দিল —আমার কি বসে থাকলে চলে? এতগুলি লোকের পেটের ভাবনা। নিস্তার চলে গেল।

বস্তির ঘরগুলো সমান নয়। নিস্তার নিজে যে পাশটায় থাকে সেটা দোতলা, ওরই মধ্যে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সামনের বারান্দা দিয়ে প্রায়ই নূতন নূতন মুখ দেখা যায়।

বাড়ীটার দু'পাশ দিয়ে একতালা খোলার ঘরগুলো গোল হয়ে ঘুরে গেছে। ঢোকার রাস্তা সামনের দিকে। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্নের সীমানাটা ছেঁড়া চটের পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা, আবরু না বাঁচলেও দু'পক্ষের বিভেদটা বেশ বোঝা যায়—সেইটাই বোধহয় মালিকদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

উঠানে পড়ে কাঁদছে ছেলেটা, মণিরামের বউ বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে; তার চেহারাও গিয়েছে খারাপ হয়ে, দীর্ঘদিনের রোগ ভোগের পরেই যেমন হয়। ছেলেটাকে শান্ত করবার চেষ্টা দূরে থাক্ পিঠের উপর বসিয়ে দিল গোটা দুই কিল—মরেও না হতভাগা, মরলেও তো বাঁচি—এত জ্বালা আর নিত্যি সহ্য হয়না বাপু আমার। পাশে বসে পড়ে সেও হাঁপাতে লাগল।

উঠানের এক পাশেই গোল হয়ে কি যেন একটা পড়েছিল, সেইটে একটু নড়ে উঠল—কি হল গো দিদি? সকাল বেলাই বকতিছ কেন?

মণিরামের বউ নিজের শোক ভুলে সেই দিকে তাকাল,—সুবাসী না? অমন ভাবে পড়ে কেন রে?

উঠতে আর পারছিনে যে, কন্‌টোল থেকে অনেকটা রাস্তা আসতি মাথা ঘুরে এখানেই পড়িয়েছিলাম, এট্টু জল দিবা ভাই?

মণিরামের বউ কল খুলে জল নিয়ে এল একটা ঘটিতে করে। খানিকটা দিল একটু একটু করে মুখে ঢেলে বাকিটা দিল মাথায় আর সারা মুখে ছিটিয়ে। কোনমতে শক্তি সংগ্রহ করে টলতে টলতে উঠে বসল সে—আঃ বাঁচালে, সারা রাত্‌টা এখানে পড়েই কাটিছে ভাই।

সে কিরে? সারা রাত্‌টা এখানে কাটালি, কেউ হাত ধরেও তোলে নি?

তোলবে কি? কেউ কি আর ধাতস্থ আছে রে? নিজের জ্বালায় মরছে সব, আমারে কেডা দেখে?

তাও বটে, কাল চাল পাইছিলি? গিছিলি যে!

তা আর পাইনি, দুয়োর ধরে পড়েছিলাম পশু' থেকে, প্যাটে চাড্ডে দানা পড়া তো চাই।

মণিরামের বউ দু'একবার ইতস্ততঃ করল,—আমারে দুটো দিবি ভাই? এক পোয়াটাক্, ছেলেডা কাল থেকে খাতি না পেয়ে সকাল থেকে বায়না ধরেছে। মিন্সে যে কয়দিন হল কনে উধাও হোল কেডা জানে? বোধ হয় ফেলে পালাইছে।

সে কিরে? ধর্ম্মভয়ও নেই? বলি ছেলে কি তোর একলার, তা কতি পাল্লি নে?

কয়ে তো আর যায়নি, আর ছেলের মা হইছি যখন তখন প্রায়শ্চিত্তির তো করতেই হবে। পুরুষ হলে না হয় ফেলে পলাতাম খাত্তি দিবার ভয়ে। তা নেব দুডো চাল?

নে চাড্ডি বেশী করেই, কোনমতে ফুটোয়ে দে আমো চাচ্ছে খাই, শরীলে আর জো নেই যে উঠে বসি। আঁচলির থে খুলে নে।

মণিরামের বউ তাড়াতাড়ি ওর আঁচল ধরে ঝাড়ল—ও কিলো, ঠাট্টা করিস নাকি? কিছু তো নেই তোর কাপড়ে।

নেই? নিজের হাতে বেঁধে আনলাম কাপড়ে, গেল কনে?

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল দুজনে মুখোমুখী হয়ে। নেই নেই—দুর্দিনের বাজারে বস্তিশুদ্ধ লোক না খেয়ে আছে, আঁচলে বাঁধা চাল হীরের টুকরো চাল উঠানে পড়ে থাকলে চোরের হাত থেকে কতক্ষণ বাঁচে।

যদি রাত্তিরে তোরে একবার ডাকতে পাত্তাম রে। হাহাকার করে উঠল সুবাসী। যেটুকু জোর দিয়ে বসেছিল এতক্ষণ সব যেন নিঃশেষ হয়ে গেল শরীর থেকে, উবুড় হয়ে পড়ে গেল সে। ধরবার শক্তি মণিরামের বউয়েরও নেই—কোনমতে বসে রইল সেও। বড় আশা করেছিল ছেলেটাকে একগ্রাস খেতে দেবার।

এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে নেমে এল শৈল। ভদ্রঘরের মেয়ে সে। কেমন করে অনেক আঁকা বাঁকা রাস্তাঘুরে নি[illegible]র বাড়ীওয়ালীর হাতে এসে পৌঁছেছে যে, তার ইতিহাস লেখা আছে ওর বুকের রক্তে।

ভদ্রঘরের মেয়ে সে, ঢাকা জেলার অখ্যাত এক পাড়াগাঁয়ে তার বাড়ী। বাপ নিবারণ চক্রবর্ত্তী বড় লোক না হলেও সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন, দশ ভিটা খামার ছিল ওদের। বাপে বেটায় চাষ করে ফলাত সোনা, বোঝা মাথায় করে বিক্রী করে আসত গ্রামের হাটে। তাছাড়া ছোট ভাইটা ফিরি করে বেড়াত গ্রামের পথে পথে, সাবান আলতা তেল ফিতে আর অনেক জিনিষ।

দু-ভাইয়ের একটিমাত্র বোন শৈল—কত আদরের। অনেক নিন্দা, অনেক উপদ্রব সহ্য করেও গ্রামের স্কুলে পড়িয়ে ছিল ওকে, মাইনর পাশ করেছিল খুব ভালভাবে। নেহাৎ ভাল করে পড়বার সুবিধা নেই গ্রামে, সেইজন্যই আর পড়তে পারেনি সে।

ভাল ভাল ঘরে সম্বন্ধ করতো শৈলর, একটি মাত্র মেয়ে—ভাল ঘরে দেবার আগ্রহ তাদের কত। দাদা প্রায়ই বলত, না হয় দু'শো পাঁচশো ধারই করা যাবে—তবু শৈলিকে বড় ঘরে দিতে হবে। ভগবান যদি বাঁচিয়ে রাখেন শোধ দিতে আর কদিন ?

মা একটু হাসতেন ওর চওড়া বুকখানার দিকে তাকিয়ে, গর্ব্ব করার মত ছেলে তাঁর !

সেই শৈল, কোথায় এসে পড়েছে আজ, ছত্রিশ জাতের লোকের কাছে নিত্য দেহ বিক্রয় করে হচ্ছে তার পেটের খোরাক যোগাড়। না করেই বা উপায় কি ? নিস্তারের শাসন বড় কড়া।

এখানে তার এসে পড়বার ইতিহাস মনে হলে আজও তার চোখে জল আসে, চট্ ক'রে মুছে ফেলল শৈল। বাপ ভাইয়ের আর দোষ কি ? কোন ক্রমে বেঁচে থাকবার প্রয়োজনীয়তা কি তারই ছিলনা ?

কি কাল যুদ্ধই বেধেছিল—তার জীবনের আশা ভরসা সব শেষ হয়ে গেল। গ্রামে গেল জমিটুকু—তারপরে দোকান লাঙ্গল গরু ঘটি বাটি, সব শেষে গেল দাদার ছেলে দুটো—উঃ কচি কচি অবোধশিশু একৈকণা ভাতের অভাবে একটু একটু করে শুকিয়ে কুঁকড়ে ছোট হয়ে মরে গেল তারা, ওদেরই চোখের ওপর।

চালে খড় নেই, ঘরগুলো একে একে যাচ্ছে পড়ে। একদানা চাল নেই ঘরে, ঘাস পাতা যা পড়ছে সামনে তাই খাচ্ছে মানুষ—তবু

ক্ষিদে মেটেনা। সে কি তীব্র যন্ত্রনা পেটের মধ্যে, এখনও মনে হলে তার বুকের ভেতর জ্বালা করে ওঠে—উঃ ভগবান!

আজ শৈল খেতে পায় পেটভরে ভাত, মাছ, তরকারী—পরনে ওর চওড়া পাড় পাত্‌লা পাত্‌লা শাড়ী—ব্যবহার করে দামী তেল, সাবান, স্নো, পাউডার। খদ্দের বুঝে নিস্তার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের সাজগোজের তদারক করে। ক্যাম্প থেকে লোক এলে নূতন করে সাজতে হয় ওদের। প্রথম প্রথম ভয় করত, কষ্টও হত, আজকাল সব সয়ে গেছে শৈলর। ওরা আসে কিছু ক্ষণের জন্য ওর দেহটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে—বিনিময়ে দিয়ে যায় রাজার মুখ আঁকা কাগজ—কথা না বুঝলেও হাত পেতে নিতে বাধেনা ওর। নেবেই বা না কেন? নির্য্যাতীতা নারীত্বের চরম পুরস্কার।

রাগ করবে সে কার ওপর? দেবতা বা মানুষ কারো বিরুদ্ধে তার অভিযোগ নেই। ভগবান বলে কিছু নেই, ছোটবেলা থেকে অনেক ডেকেছে তাকে, পেটের খিদে তাতে মেটেনি, মরণ আসেনি; এমন কি সেইদিনে—মনে করতে আজও সারাগায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, যেদিন প্রথম ওর ঘরে লোক ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ক রে দিয়েছিল নিস্তার—ওর আর্ত্তনাদে সেদিন কেউ কান দেয়নি না মানুষ—না ভগবান। তার চেয়ে যা ঘটছে প্রতিদিন ওর অদৃষ্টে তাকে মেনে নেওয়াই ঢের ভাল। পাপের ভয় শৈল করে না, কেন করবে? ওর ক্ষুধা আছে, অভাব বোধ আছে, দুঃখ আছে, বেদনা আছে, সবই দিয়েছে কেউ একজন, অথচ দেয়নি বেঁচে-থাকবার উপায় করে, দেয়নি আত্মরক্ষার উপায় করে। অসহায় দুর্ব্বলা নারী, স্রোতের মুখে কুটোর মত ভেসে চলেছে সে। হাত বাড়িয়ে কোথাও পায়নি অবলম্বন, পেটের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে নারী ব্যবসায়ীর হাতে জেনে

শুনে ওর বাপ মা দিয়েছে আপন সন্তানকে বিক্রি করে—পাপের ভয় ও করবে কেন ?

শুধু কি সেই একা ? আনন্দ, লক্ষ্মী, আশা, অমিতা, নন্দা, ছন্দা, আরও কতজন আছে নিস্তারের হাতের পাশার ঘুঁটি হয়ে। নিস্তার ওদের কিনিয়ে আনে মোটা দাম দিয়ে, ওৎ পেতে থাকে ওস্তাদ জহুরীর মত, দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত বুঝে ছোঁ মেরে নিয়ে আসে এদের—যুদ্ধের বাজারের চাহিদা মেটাচ্ছে ওদের দিয়ে, করছে মোটা রোজগার। তার কাছে আসা যাওয়া করে অনেকে, দুর্দ্দিনের সুযোগ নিয়ে অনেকেই করছে ব্যবসা, সব থেকে লাভের ব্যবসা। এখান ওখান থেকে গাড়ী ভর্ত্তি করে আনছে মেয়েদের, অলিতে গলিতে বসিয়ে দিচ্ছে তাদের কিম্বা খুলছে সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়। খুলছে আর্ট ষ্টুডিও, অর্ডার আনছে মিলিটারী সাপ্লাইএর—রাতারাতি হয়ে যাচ্ছে বড়মানুষ। দামী স্যুট্ পরে, নূতন কেনা মোটরে চড়ে, সিগারেটে দুটো একটা টান মেরে ফেলে দিচ্ছে সেটা—ঘুরে বেড়াচ্ছে ভদ্রতার মুখোস পরে। ওদের পার্টিতে আনাগোনা করছে অনেকে, ঐশ্বর্যের চাকচিক্যে ঢাকা পড়ে আছে অপমানিতা নারীর করুণ ক্রন্দন—টাকার ঝঙ্কারে ওদের কান হয়ে গেছে বধির—শুনবে কে ?

শৈলকে নিস্তার ভাল করে ট্রেনিং দিয়েছে। মেয়ে যোগাড় করে আনতে ওই এখন ওর ডান হাত বললেও চলে। এ কাজ শিখতে তার বেশী দেরী লাগেনি, সংসারের ওপর কেমন একটা আক্রোশ হয়েছে শৈলর—মেয়েদের উঁচু মাথা যেন আর দেখতে পারে না ও, ইচ্ছা করে টেনে আনে এই পাঁকের মধ্যে, ছিটিয়ে দেয় সর্ব্বাঙ্গে নোংরা জিনিষগুলো, জানালায় আড়ি পাতে ও, সবে ভুলিয়ে আনা মেয়েদের প্রথম দাগ লাগাবার দিন।

পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমায়···ও ঠাকুর-ও ঠাকুর —আর্ত্তনাদ করতে থাকে অসহায় মেয়েগুলো। বড় ভাল লাগে ওর। কেমন জব্দ—কেউ কেউ আবার ডাকতে থাকে নিস্তারকে—কাকুতি মিনতি করে শৈলর কাছে, শৈলর সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে ওঠে, কেমন একটা তৃপ্তি বোধ হয়। পায়ে ধরে, ঠাকুরের নাম করেছে একদিন সেও—অনেক চোখের জল ফেলেছিল, কিন্তু কে তাকে ক্ষমা করেছে?

সুন্দর করে সেজেছে শৈল, একেই তো ওর চেহারা বরাবর ভাল; ভাল ভাবে খেতে পরতে পেয়ে, কলকাতার জলহাওয়া লাগিয়ে তাতে আবার শ্রী বেড়ে গিয়েছে আরও। গায়েও একটু মাংস লেগেছে, রং হয়েছে আরও পরিষ্কার।

নেমে এসে বরাবর মধু ডাক্তারের বারান্দায় এসে দাঁড়াল শৈল—মধু ঘরে আছ? কলেরা হোক্, টাইফয়েড হোক্, বসন্ত হোক্, —বস্তির একমাত্র ডাক্তার মধু। খানিকটা হোমিওপ্যাথি ওর পড়া আছে, পয়সার অভাবে বাকীটা কলেজে আর সারা হয় নি। রোগীরা বলে বাকীটা ও ঘরেই সেরে নিয়েছে ভাল করে।

মধুর পূর্ব্ব ইতিহাস এদের জানা নেই। বছর দশেক আগে ছোট্ট একটা মেয়ের হাত ধরে কোথা থেকে এসে হাজির হয়ে, অল্পদিনেই জাঁকিয়ে বসে এদের মধ্যে। মধুর মেয়ে বেশ বড় সড় হ'য়ে উঠেছিল—আজকাল সেও কোথায় ব্যবসা খুলে বসে গেছে। তা যাক্, তাতে মধুর দুঃখ নেই, কারণ এর চেয়ে আর কি ভাল অবস্থা হতে পারত তার? দুঃখ এই যে বুড়ো বাপকে সে একটা পয়সাও দেয়না, এমনই অকৃতজ্ঞ মেয়ে সে।

মধু ঘরেই ছিল, সাড়া দিল—আছি ভাই। শৈল নাকি?—বোস একটু বারান্দায়, আসছি।

ডান হাতে ছোট্ট একটা মেজার গ্লাস, বাঁ হাতে ওষুধের বাক্স নিয়ে বেরিয়ে এল সে।—ওষুধের জন্য এসেছিস্? তা আমার কাছে দামী ওষুধ কিছু তো নেই, তুই বরং মোড়ের মাথায় যেয়ে ভাল ডাক্তার দেখিয়ে দুটো ইনজেকশান নিয়ে আয়। ও সব রোগে ঐগুলো তাড়াতাড়ি কাজ দেয়।

শৈল বাধা দিল,—তুমি দেবেনা তাই বল। তা আমি কি তোমায় দাম দিইনে—যে তুমি হেঁকে দিচ্ছ এমন করে? দাও না ভাই একটু দেখে শুনে।

একটু মিনতি করে ফের বল্ল শৈল,—কি করব ভাই, বোঝ তো আমারই অবস্থা। মুখে খাতির নিস্তার করে ঢের কিন্তু পয়সার বেলা ঢুঁ ঢুঁ। দশটাকা পেলে আমায় দেয় একটাকা। বেশী আমি কোথা থেকে দিই বল? তুমি যদি একটু না বোঝ।

বুঝি আমিও ঢের। আমার বউ এক বাবুর কাছ থেকে ঐ রোগ নিয়ে এসেছিল, চিকিৎসেও তো করেছিল ঢের কিন্তু হোল না ত কিছু। তোকে সত্যি বলছি শৈলি আমার কাছে নেই!

না নেই বল্লেই আমি শুনছি কিনা, দিবিনে তাই বল। শৈল অনেক কাকুতি মিনতি করল কিন্তু মধু নির্ব্বিকার, এত সহজে ভুলবার পাত্র সে নয়—তা না হলে আর এই সময়ে দুবেলা পেটভরে না হোক্,—আধপেটা পর্য্যন্ত খেতে পায়? শৈলর হাতে পয়সা না থাক্ নিস্তারের তো আছে,—তাদের দিয়ে টাকা রোজগার করছে ও—আর চিকিৎসার খরচটা কেন দেবে না? বস্তির ডাক্তার বলেই তো, না হলে এই মধুকেই রীতিমত তখন ভিজিট দিয়ে ডাকতে হোত। শুধু ওষুধের দামটা তাও দুপয়সা লাভ দেবেনা ওরা?

এমন সময় নিস্তার ফিরে এল—ওখানে কি করিস্ শৈলি ?

জবাবটা মধুই দিল, ওষুধের জন্ম এসেছে, তা ওর খরচাটা কি ও দেবে না তুই দিবি ?

আমি দিতে গেলাম কেন শুনি ? নিস্তার ভেংচি কেটে উঠল,—ব্যামো কি আমার হয়েছে না চিকিৎসে হবে আমার ?

না হলেও তোর কিছু দেওয়া উচিৎ, ধর্ম্মে সইবে না এত, ওদের রোজগারে বাড়ী তুলেছিস তুই আর…

ধর্ম্মে সইবেনা ? কেন রে মুখপোড়া ? ধর্ম্ম বলে কিছু আছে নাকি ? তা'হলে পেটের সন্তানকে দিল কেন বাপ মায়ে বিক্রী করে ? সেই টাকার অন্ন মুখে দিয়ে গিলতে তো পিরথিমি ফেটে চৌচির হয়ে গেল না ? আর দোষ হবে আমার ?

গজ গজ করতে করতে সে ওপরে উঠে গেল, ধর্ম্ম দেখায় তাকে ? মধু ডাক্তারের দুবেলা খাবার জুটছে বলে আস্কারা বেড়েছে বড় বেশী। ধর্ম্ম দেখায় নিস্তার বাড়ীউলিকে, জানে না ও কি করতে পারে এখন ? টান্ মেরে ঘর থেকে কাপড় দুখানা ফেলে দিয়ে—দেবে নাকি উঠিয়ে ?

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দেওয়ালে লাগান পেরেকটাতে কাপড় লাগতেই ফ্যাস করে ছিঁড়ে গেল এতখানি। বিরক্ত হয়ে নিস্তার চীৎকার করে উঠলো—এই বিন্দি এই নন্দি তোরা সব মরেছিস্ নাকি ?

নন্দি, বিন্দির সাড়া পাওয়া গেল না—বেরিয়ে এল ঘর থেকে আর একটি মেয়ে—ওরা কেউ বাড়ী নেই মাসি, কোথায় যেন গেছে—তুমি চেঁচাচ্ছ কেন ?

খানিকটা রাগ ওর ওপরেই ঝেড়ে ফেল্ল নিস্তার—চেঁচাই কি আর সাধে সারাদিন তোরা করিস্ কি ? দেওয়ালের গায়ে পেরেক ঠুকলো কে ? দেখ দেখি কাপড়টা কতখানি ছিঁড়ে গেল আমার।

ওমা ঐ পেরেকটা ? ওতো তুমিই পুঁতেছিলে গো, তোমার সেই কার ছবি ঝোলাবার জন্যে, কবে আবার ঝুলুবে সেখানে কাজেই তুলিনি আর পেরেকটা, তখন তো আবার বলতে নিজের বাড়ীতে হাত পা মেলে থাকার যো নেই। তোমার বাপু সব উল্টো উল্টো কাণ্ড।

নিস্তার বাড়ীওয়ালীর মুখের উপর প্রতিবাদ করতে সাহস করতো-না কেউ। কিন্তু এ মেয়েটার সবই উল্টা ধরণের, অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেও কিছুনা কিছু বলে ফেলে। বোধ হয় ভাল করে পোষ মানেনি এখনও।

অন্য সময় হলে নিস্তারও চুপ করে সয়ে যেতনা, কিন্তু আজকে হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লে সে, মেয়েটা সেই অবসরে সরে পড়ল।

অনেকদিন আগেকার একটা ছবি মনে পড়ে। বাড়ীর পিছনটা জঙ্গলে ভরা, দুহাতে ডাল পালা সরালে তবে অল্প একটু জলে ভরা ডোবাটা দেখা যায়। বেশ নিরিবিলি যায়গাটা।

আগেই খবরটা দেওয়া ছিল, পা টিপে টিপে বীণা এসে ওর চোখ টিপে ধরল, চমকে উঠলো নৃপেন,—এত দেরী যে ? বাইশ বছরের দুরন্ত যৌবন ওর সারাগায়ে, চোখের তারায়—ঝিকমিক কচ্ছে জ্যোৎস্নার আলো।

তাড়াতাড়ি আসব কি করে বলো; একটু দেখেশুনে তবে তো আসবো।

তুমি তা'হলে এলে শেষ পর্য্যন্ত; আমি ভেবেছিলাম...

মুখের কথা কেড়ে নিল রীণা—ভেবেছিলে আসব না এই তো?

ঠিক তা নয়, হয়ত পারবে না।

স্ফুরিত অধরা অভিমানিনীর মুখ কৌতুকহাস্যে অপরূপ হয়ে উঠেছে—তোমার জন্যে কবে কিনা পেরেছি বলতো!

তা হলে আর দেরী করে কাজ নেই চল।

চল—নৃপেনের হাত ধরে অচেনা পথের দিকে পা বাড়াল রীণা—আমরা প্রথমে কলকাতায় যাব তো?

ওখানেই যেতে হবে আগে নইলে বিয়ে হবে কোথায়? নৃপেন ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে আনল—এতদিনে তোমায় পেলাম—না রিনু?

কবে না ছিলাম তোমার? রীণা উত্তর দিল।

তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো, রীণা?

বিস্মিত দৃষ্টিতে রীণা ফিরে তাকাল—কেন বলতো?

এই আমার সঙ্গে চলে যেতে। এতদিনের পরিচিত ঘর বাড়ী ছেড়ে অজানা, অচেনা এক জনের সঙ্গে চলে যেতে।

না গো না, আর কতবার বলব তোমাকে? তোমার হাত ধরে এইটুকু রাস্তা তো দূরের কথা আরও অনেক অনেক দূরে চলে যেতে পারি আমি।

গিয়েছেও তো, তাই, অনভিজ্ঞ পাড়াগাঁয়ের মেয়েটি। বিধবার বিয়েতে অভিভাবকের মত হবে না বলে ভুলিয়ে এনে এমন করে সর্ব্বনাশ করবে সে—তা কি তার জানা ছিল? এতদিনের চেনাশুনা, ভালবাসার সুযোগ নিয়ে ছুঁড়ে ফেলবে তাকে আস্তাকুঁড়ের মধ্যে অকৃতজ্ঞ পুরুষ—তাই কি তার জানা ছিল? বিশ্বাসের সুযোগ, ভালবাসার

সুযোগকেও যে বাজারের পণ্য হিসাবে ব্যবহার করে ওরা, তাও তো তার অজানা ছিল। আর সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে শিশু সন্তান বুকে ধরে চোখের জল মুছতে মুছতে বীণার নবজন্ম হল নিস্তার বাড়ীওয়ালীর ভূমিকায়।

পুরুষের নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ নিতেই তো সে নির্ভয়ে চলেছে? ঘরে ঘরে আনন্দ দীপ নিভিয়ে, ছিনিয়ে আনছে মেয়েদের—যাদের কেন্দ্র করে সংসার ওঠে গড়ে, পৃথিবী ভরে ওঠে অনিন্দ্যনীয় সুষমায়।

যুদ্ধের সুযোগ সে পুরোপুরি করেই গ্রহণ করেছে। লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে, সময় বুঝে ছোঁ মেরে কাজ হাসিল করে চলেছে। পুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে ওর সংগ্রহ করে আনা বিষে। জর্জ্জরিত হয়ে উঠছে কত ঘর, বিকৃত দেহমন নিয়ে পৃথিবীতে আসছে পাপীদের বংশধর।

যুদ্ধ চলুক ঘরে ঘরে, বাড়ুক অভাব অভিযোগ আর হাহাকার, তার মধ্যে পথ করে চলুক নিস্তার বাড়ীওয়ালীর বিজয় অভিযান : কোনদিকে তাকাবে না সে, কেন তাকাবে? কে চেয়েছিল তার দিকে?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জানালা থেকে সরে এল কল্পনা—ভাববে কি আর? মাঝে মাঝে যখন মনটা খুব খারাপ হয়ে ওঠে তখনই একবার ক'রে এখানটায় এসে দাঁড়ায়। নিপীড়িতা লাঞ্ছিতা মেয়েদের কাহিনী, যা বলবার মত ভাষা নেই ওদের, যার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না ওরা, পুরুষের সমাজ যাদের ঝাঁটিয়ে ফেলেছে আবর্জ্জনার মত ক'রে গৃহ-সীমানার বাইরে, কপালে কলঙ্কের পঙ্কতিলক এঁকে দিয়ে—তারই ছবি ফুটে উঠেছে ওদের জীবন ধারার প্রতিমুহূর্ত্তে, ওদের প্রত্যেক দিনটার পুনরাবৃত্তির ইতিহাসে।

হয়ত, মনে মনে ভাবল কল্পনা, সুযোগ পেলে ওরাও একদিন গৃহস্থের ঘরের আঙ্গিনায় ফুটে উঠতে পারত—রজনীগন্ধার কুঁড়িটার মত, বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া সুগন্ধের মত; ওদেরও স্নেহে, প্রেমে, মমতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারত আত্মীয় স্বজন ওদের পরিজন। হয়ত, ওদের কোল বেয়ে নেমে আসত স্বর্গের শিশু, কলকাকলীতে ভরে দিতে পারত তাদের ঘর, মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠতে পারত একদিন।

বঞ্চিত, বিকৃত, লাঞ্ছিত জীবনে অভ্যস্থ ওই ওরা। ওই নিস্তার, ওই সুবাসী, ওই শৈল, ওই আশা, ওরাও কি একদিন ওদের মত করেই মায়ের কোলে এসে জন্ম নেয়নি এই পৃথিবীতে? ওদের আধ আধ কথায় ভরে ওঠেনি গরীবের ভাঙ্গা ঘর? সেদিন কে ভেবেছিল আজকের এই পরিণতির কথা।

ওরাও কি হতে পারত না—ঘরের বধূ লক্ষ্মী কল্যাণী, ওরাও তো হতে পারত জননী, হতে পারত প্রিয়া, কিন্তু কঠিনতম আঘাতে মানুষ

তাকে করে তুলেছে কাল-নাগিনী, কিন্তু তাদের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে এরাই যে দিন দিন জীর্ণ হতে চলেছে এ উপলব্ধি করবার শক্তি এদের কবে হবে?

আস্তে করে প্রকাশ ওর মাথার উপর হাত রাখল—রানু কি ভাবছ?

প্রকাশ—মাথা তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল কল্পনা—ভাবছি এত দুঃখ, এত বেদনা আমাদের দেশে? কি করে মানুষ এত সইতে পারে? এর কি শেষ নেই?

নিশ্চয়ই আছে—আর সেই আশাতেই তো আমরা বেঁচে আছি। আমরা দেখে যাব, জেনে যাব কোথায় এর ত্রুটি, অন্তের অগোচরে কোথায় চলছে ছন্দপতন। তার পরে চীৎকার করে জানাব সব লোককে—ওরা জানবে, ওরা ভাববে, ওরা মানুষ হবে। আশাতেই মানুষ বেঁচে থাকে, না? আমরাও তো আশা করেই চলেছি, প্রতিদিনকার অভ্রান্ত সংগ্রামে—এই দুঃখ, এই বেদনা, এই লাঞ্ছনার মধ্যে পথ ক'রে; সম্বলতো শুধু ওই নিবু নিবু আলোটুকু, আমাদের আশা আর আকাঙ্ক্ষা, আমাদের বড় হবার প্রেরণা।

দরজার ওপর ছায়া পড়ল কার, ওরা দু'জনেই ফিরে চাইল, হাসিমুখে পুষ্পিতা আর তার সঙ্গে আর একজন কে।

পরিচয় করাতে এলাম। কল্পনা, আমার এককালের সহকর্ম্মিণী, বর্ত্তমানে অভিন্নহৃদয় বন্ধু, আর ইনি কমরেড প্রকাশ, সংসারের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। ওরা দু'জনেই ঘরে ঢুকল।

আর এঁর পরিচয় দিলে না পুষ্প, তোমার পরিচয়ই ওঁর পরিচয় নাকি? সহজভাবে কল্পনা হেসে উঠল।

ভাবলে খুব বেশী দোষ করবে না ভাই, তবে মোটামুটি এর পরিচয়—অর্ডার সাপ্লাইয়ার মিঃ চ্যাটার্জ্জি বলে।

ছোট্ট খাটের ওপর ছোট্ট একটা মাদুর বিছিয়ে বসল ওরা। সাহেবী পোষাক পরা চ্যাটার্জির জন্যে বার হোল খাটের তলা থেকে বহুদিনের কাৎ হয়ে পড়া মাঝারি সাইজের একটা বেতের মোড়া।

আপাততঃ এইটেতেই একটু কষ্ট করে বসুন, মধ্যে মধ্যে আপনার আসা-যাওয়া ঘটলে একটা চেয়ার টেবিল যোগাড় ক'রে রাখব না হয়। কি বল পুষ্প?

ইচ্ছে হলে রাখতে পার, কারণ ওর আসা-যাওয়া ঘটবেই আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি। আপাততঃ তুমি চলনা আমার সঙ্গে।

কোথায় যাচ্ছ তুমি?

যাচ্ছি শিলং, উনি একটা অর্ডার আনতে যাচ্ছেন, তা ছাড়া শিলংএর য়্যানাল্লার য়্যাট্রাকসন আছে, শেষের কবিতার দেশ—

বিশেষ উৎসবটা কি সেখানেই সারবে? আইডিয়াটা চমৎকার। ওর আবার আর্টিষ্টিক টাচ্ আছে কিনা। তা তুমি যাচ্ছ তো আমাদের হেল্প করতে? প্রকাশ বাবু আপনিও যাবেন তো?

আমাকে আবার টানাটানি কেন? এসেছেন তো বন্ধুকে নিতে, তাকেই নিয়ে যান্—তাছাড়া আমাকে চিটাগং যেতে হবে একবার।

সত্যি নাকি, কই আমাকে তো বল নি? কল্পনা বলে উঠল, আজকাল তুমি খুব রিজার্ভ হ'য়ে যাচ্ছ দেখছি।

আজকেই অর্ডার পেলাম অফিসে, বলব আবার কখন?

চিটাগং অন দি কর্ণফুলী—ছোট্ট মেয়ের মত হাত তালি দিয়ে উঠলো কল্পনা—ভারী সুন্দর সিনারী ওর, আমারও যেতে ইচ্ছে করছে। নেবে প্রকাশ আমাকে সঙ্গে?

শিলংএর চেয়ে সুন্দর নিশ্চয়ই নয়, মিঃ চ্যাটার্জি প্রতিবাদ করলেন—আপনাকে বলতে এলাম সঙ্গী হবার কথা, আর আপনি যেতে চান চিটাগং, বেশ লোক আপনি।

লোক নয়, স্ত্রীলোক—পুষ্পিতা হেসে উঠল—উনি আবার সাহিত্যিকা কথায় কথায় ভুল ধরেন—বি কেয়ারফুল চ্যাটার্জি।

তাই নাকি মিস্ রয়? তাহলে আপনি একজন গুণী, আলাপ করতে পাওয়া সৌভাগ্য আমাদের।

সৌভাগ্য এখনও হয়নি—পুষ্পিতা ওর ভুল সংশোধনের চেষ্টা করল—তবে হতে পারে যখন উনি বিখ্যাতা হবেন। সম্প্রতি নেহাৎ অখ্যাতনামা এবং সমালোচনার বস্তু।

খুব কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছ যা হোক, এর পরে তোমাদের কিছু মিষ্টি খাওয়ানো দরকার।

মিষ্টি কনট্রোলড্, তবে তুমি মুড়ি খাওয়াতে পার, যদি চাও, আমি আমাদের দিশি খাবারগুলোকেই ভালবাসি বেশী।

আপনারা একটু বসুন, আমি এক্ষুনি আসছি।

তা না হয় বসলাম, কিন্তু আপনি চলেছেন কোথায়?

আপনার মুড়ির ব্যবস্থা করতে, দেরী হবে না, কাছেই একজন এই সময়টাতে গরম মুড়ি ভাজে।

পুষ্পিতা হাত দিয়ে দরজা আটকাল—না না আপনি যাবেন কি! কল্পনা তোর সেই বাসন মাজত সেই বুড়ীটাকে বল না—মুড়ি আনতে।

প্রকাশ হেসে ফেল্ল, বুড়ী অনুপস্থিত, আর যদি থাকতই তা হলেই বা কি? দু'পয়সার জিনিষ কিনতে বুড়ো মানুষটাকে কষ্ট দেবার চাইতে আমারই যাওয়া উচিত নয় কি? নিজের কাজ করতে লজ্জা পান কেন?

গরম টাট্‌কা মুড়ী, তেল নুন দিয়ে মেখে নিয়ে এল কল্পনা। সবার আগে মিঃ চ্যাটার্জ্জি হাত বাড়ালেন—দিন, গরম মুড়ি ঠাণ্ডার দিনে চায়ের চাইতেও অনেক বেশী ডিলিশাস্।

খেতে খেতে ফের যাবার প্রসঙ্গ উঠল। অনেক বাগ-বিতণ্ডার পরে ঠিক হ'ল শিলং ওরা যাবে—তবে তার আগে চিটাগং ঘুরে যাবে কল্পনা, যুদ্ধের জেরটা ওর ওপরেই ঝুঁকে পড়েছে সব চাইতে বেশী। কাজেই সেখানকার অবস্থাটা একবার দেখা দরকার। এর মধ্যে মিঃ চ্যাটার্জ্জি আর পুষ্পিতা যাবেন শিলং, সেখানেই ওদের বিয়ে। ওদিককার কাজ সেরে কল্পনা আর প্রকাশ দু'জনেই যাবে ওদের উৎসবে যোগ দিতে।

ওরা চলে যাবার আগে কল্পনা চুপি চুপি পুষ্পিতার কানে কানে জানাল অভিনন্দন,—খুব খুসী হইলাম ভাই, তোর সেটেলড্ হবার কথা জেনে। যাই বল না কেন সাধারণ জীবনে মনোমত স্বামী লাভের চাইতে সুখের আর কি হতে পারে? আশা করি দুজনেই সুখী হতে পারবি দু'জনকে পেয়ে।

বেশ তাই, কিন্তু নিজে আর কতদিন এভাবে কাটাবি বলত? তোর কি উপায় হবে?

দরকার বুঝলে না হয় তোর বাড়ীতেই ওঠা যাবে, তখন কিছু একটা করিস্।

তুই কিনা সেই মেয়ে—পুষ্পিতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল—বুক ফেটে গেলেও কারো কাছে সাহায্য চাইতে পারবি?

হয়ত পারব না, কিন্তু যদি কখনো সে দুর্দ্দিন আসে, তোর দরজা খোলা পেলে তোর ওখানেই ওঠা যাবে, কি বলিস্?

ওরা বিদায় নিল। পুষ্পিতা আর মিঃ চ্যাটার্জি, বেশ লোক, না প্রকাশ? এতদিনে পুষ্প সুখী হবে, কি বল?

নিশ্চয়ই, স্রোতের মুখে শ্যাওলার মত ভেসে বেড়ান মেয়েদের মানায়ও না। লাঞ্ছিত, অপমানিত ভাগ্য নিয়ে আমরাই করে বেড়াচ্ছি বেঁচে থাকার সাধনা, তার মধ্যে তোমাদেরও ছুটে বেড়াতে দেখা কত বড় দুরদৃষ্ট—এ তোমরা বুঝবে না!

কেন বলত? তুমি কি চাও, দুঃখ দুর্দ্দশা শুধু তোমরাই আড়াল করে নাও—তাতে অংশ নেবোনা আমরা? বেঁচে থাকার দায়িত্ব কি একা তোমাদের?

নয় বলেই তো আরও চাইনা প্রতিদিনকার কঠিন বাস্তবের আঘাতে তোমরা ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠো, সেও যে আমাদেরই অগৌরব। তোমাদের কাজ করবে তোমরা, আমরা করব আমাদের, দুজনে মিলে যদি এক কাজে মিশে যাই তাহলে বাকীটুকু যে অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে।

তবে মেয়েদের কি করা উচিত বলত?

তারা কল্যাণী তারা লক্ষ্মী, তারা জননী। তারা পূর্ণ করে তুলবে আমাদের দুঃখ, দৈন্য দুর্দ্দশায় ভরা ছোট ঘর। মানুষের মত মানুষ করে তুলবে ভবিষ্যতের ছেলেমেয়েদের। কঠিন ভাগ্যকে জয় করে আনবে যারা অমৃতের সন্ধান, তাদের মধ্যে জন্ম নেবে আর এক রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র। সেই আশাই তো আমার এ যুগের মেয়েদের কাছ থেকে। তারা শিক্ষা পেয়েছে, বড় হবার সুযোগ পেয়েছে, চিন্তার পরিধি আমাদের ঘরের আবেষ্টনী ছাড়িয়ে আরও দূরে ছড়িয়ে পড়েছে। পরাধীন দেশের আত্মবিস্মৃত জাতের সঙ্গিনী তারা, আমাদের চোখে ফুটিয়ে তুলবে সুদূর প্রসারী

দৃষ্টি, এই তো তোমাদের কাজ। আমাদের যদি সাহায্য করতে চাও তো তাই করো।

প্রকাশের মুখের দিকে চোখ ফেরাল কল্পনা, ও যেন কোন এক অনাগত দিনের কথা ভাবছে, স্বপ্ন দেখছে সুখ এবং সমৃদ্ধির। কিন্তু সেদিন আসবে কবে? কতদূরে দেখা যাচ্ছে তার চলার পথের রেখা? পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে, নদী পার হয়ে, আঁকা বাঁকা রাস্তা বেয়ে সে কি আজও আসছে?

এত কাজ, এত শ্রী মেয়েদের? তবে আকাশ বাতাস ভরে কান্নার স্বর শোনা যায় কেন? উৎপীড়িতা ধর্ষিতা নারীর অপমানের লজ্জায় ঘনিয়ে আসে অন্ধকার, শুধু তারই প্রতিকার নেই কেন?

কেন—কেন, কেন?

১৯

পুষ্পিতা চলে যাবার দিন তাকে দিয়েছিল আরও একটা খবর, নন্দিতা বালিকা বিদ্যালয়ে চাকরী খালি হবার সংবাদ। বিকালের দিকে অনেক আশা নিয়েই বেরিয়ে পড়েছিল তাই কিন্তু কিছুই হোল না, মাইনে অত্যন্ত কম। শুধু তাই নয়, ছুটির মাইনে দাবী করতে পারবে না এই সর্ত্তেই তাকে যোগ দিতে হবে। কিন্তু অভাব যতই বেশী হোক্ না কেন—নিজেকে এতখানি দয়ার পাত্রী করে তুলতে কল্পনার আত্মসম্মানে বাধল।

ফেরার পথে নামল টিপি টিপি বৃষ্টি, তার সঙ্গে ঘনিয়ে এল অন্ধকার। বোধ হয় আট্‌টা বেজে গেছে। প্রায় একরকম ছুট্‌তে আরম্ভ করে দিল সে। প্রকাশ আজ এদিকে আসতে পারেনি, যাবার আয়োজন করতে ব্যস্ত আছে। বাড়ীর দরজার কাছে বসে কে যেন।

কে রে? কি চাই?

উত্তর না দিয়ে এগিয়ে এলো একটি মেয়ে, বয়স বোধ হয় ওরই মত হবে, কিন্তু দুর্দ্দশার তালি মেরে এগিয়ে গেছে যৌবনের প্রান্ত সীমায়। শীর্ণ জীর্ণ অবসন্ন চেহারা, রুক্ষ চুল উড়ছে মাথায়, চোখে পাগলের মত দৃষ্টি, বুকের ওপর কচি একটা রুগ্ন শিশু।

কি চাস্ তুই এখানে? ঘরে আমার কিছু নেই ভিক্ষে দেবার মত, বিরক্তভাবেই বল্ল কথাটা। প্রতিদিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংঘর্ষে ওর মনের সে সহজ অবস্থা দিন দিন যেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা ভীত ভাবে ওর মুখের দিকে তাকাল। ভয়ে ভয়ে বল্লে—ভিক্ষে চাইনে মা, একটুখানি জায়গা দেও আমারে।

এই কচি বাচ্চাটা নিয়ে এত ঝড় জলে যাব কোহানে? এট্টু দয়া কর মা। কঙ্কালসার শিশু সেও যেন হাত পা মেলে ওর দয়া ভিক্ষা করতে চায়।

নারীজন্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি মাতৃত্ব। দুর্ব্বল, অসহায়, পায়ে পায়ে শৃঙ্খল জড়াবার মত মাতৃত্ব, শুধু শ্রেষ্ঠ পরিণতিই নয় সে ওদের শ্রেষ্ঠ অভিশাপও। তবু তাড়িয়ে দিতে বাধল—আচ্ছা থাক দরজা বন্ধ করে বারান্দায় এক কোণ ঘেঁসে শুয়ে।

মাথার ওপরে বেশীটাই খোলা আকাশ, তবু দরজার ওপাশে যেতে পারায় বেচারীর আনন্দের সীমা নেই, বুকের মাঝে ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরে তৎক্ষণাৎ পড়ল শুয়ে। ওর বোধ হয় আর দাঁড়াবার বা বসে থাকবার শক্তি নেই।

কিছু খেতে দিলে হ'ত। কিন্তু কিই বা দেবে? বিকাল না হতেই বেরিয়ে যাবার জন্য কিছুই যোগাড় করা হয়নি। খাবার মত ঘরে আছে শুধু সের দুই চাল আর ডাল। কল্পনারও তো খাওয়া হয়নি আজ। খোলা জায়গায় পড়ে থাকতে ওদের হয়ত কষ্ট হবে কিন্তু উপায় কি? এই তো একফালি ঘর, একা আছে সে, এর মধ্যে অচেনা মেয়েটাকেই বা ঢোকায় কি করে; কিছুই নেই ঘরে তবু যা আছে তাও যদি যায় তাহলে ও নিজেই বা হাত পাত্‌বে কোথায়?

অনেক রাত্রে ফের বৃষ্টি এলো ঝম্‌ ঝম্‌ করে। জানালা দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি এসে পড়ছে সারা গায়ে। ঘুমভাঙ্গা চোখে জানালা বন্ধ করতে গেল কল্পনা।

মোমবাতির অল্প আলোতে দেখা গেল বাইরের বারান্দার একটি কোণ। দু'হাতে বুকের মধ্যে শিশুটিকে নিয়ে জড়সড় হয়ে শুয়ে আছে ওর মা। পরনের একমাত্র ন্যাকড়ার ফালি খুলে নিয়ে যত্ন করে ঢেকে

দিয়েছে সেটাকে, নিজের দিকে ওর কোন খেয়ালই নেই, না অঙ্গহীনতার না লজ্জার।

এও বাংলা দেশের আর একটি রূপ। নিরাভরণ প্রকৃতির বুকে ঘুমিয়ে নিরাভরণ মা। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই, স্রোতের মুখে খড় কুটোর মত ভেসে চলেছে, ভাগ্যের বিরুদ্ধে জানে না কি করে বেঁচে থাকা যায়—সুন্দর করে নয়, সহজ ভাবে নয়, স্বচ্ছলতার মধ্যেও নয়। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে এনে, সকলের উচ্ছিষ্টের দানে, দয়ার সংগ্রহে কোন মতে বেঁচে থাকা; তার চাইতে অন্য উপায় ওর জানা নেই কোনো।

বুকের আশ্রয়ে ঘুমিয়ে আছে ভবিষ্যত বাংলা, ভবিষ্যতের নাগরিক। অভাব, দারিদ্র্য হাত পেতে নেবার হীনতা এই দিয়ে ওর অভিযান হয়েছে সুরু, এই দুর্দিনে, এই দুর্যোগ কাটিয়ে যদি কোনদিন সে পারে যৌবনে পৌছিতে কি পরিণতি হবে ওর? ভিখারিনী বাংলার দীনতম সন্তান, কি পরিণাম হয়ে ওদের? আর ওদের ধাত্রীরূপে কি পরিচয় হবে বাংলার?

আর পুরুষ—অত্যাচারী, দেহবিলাসী, পরিণাম-জ্ঞানহীন পুরুষ, জবাবদিহি তার করতে হবে না কোথাও? কি উত্তর দেবে সে সেখানে, ব্যাক্তিত্বের গৌরবে যেখানে জায়গা করে নিতে হয় মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়?

এই দুঃখ এই অভাব, বছরের পর বছর ধরে যারা বাড়িয়ে চলেছে, অক্ষম উপায়হীন সন্তান সৃষ্টি করে—পিতৃত্বের অক্ষমতায় সারা দেশের মুখে যারা ছড়িয়ে দিচ্ছে অপমানের কালি, এ কি তারা দেখবে না, না দেখতে পায় না? এই অগৌরব, জাতির হীনতার লজ্জার চাইতে···নিজের বিকৃত দেহলালসার দাম এত বেশী

ওরা দেয় কি করে? বন্দিনী জননীর পায়ের শৃঙ্খল যে দিন দিন ভারী হ'তে চলেছে তাঁর আপন সন্তানের কৃতিত্বে ... কি তারা বুঝতে পারেনা?

আমার দেশ, আমার বাংলা, আমার দেশের ছেলেমেয়ে—সুখী হোক, সুস্থ হোক্, সুন্দর হোক্, দিক্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ুক তার গৌরব, সুন্দর জীবনের সাধনা হোক্ তাদের, এ মন্ত্রে ওদের দীক্ষা দেবার পুরোহিত আজ রয়ে গেল কতদূরে? অক্ষম দেশে বিধাতার রোষ, বহ্নির মত জ্বালিয়ে দিতে আসছে দুর্ভিক্ষে মড়কে—অপমানিতের কষাঘাতে। ওরা কবে জাগবে?

ক'দিনের জমে-ওঠা গ্লানি বেশ খানিকটা কেটে গেল ট্রেণ ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে। গাড়ীতে ভীষণ ভীড়, একজনের ওপর আর একজন বললেও চলে। তাদের ঠেলাঠেলি করে, অনেক অনুনয় করে প্রকাশ ওর জন্য একফালি জায়গা করল বসবার—বসে পড় রাণু, দেরী করলে এটুকুও থাকবে না।

সম্ভবের চাইতেও সঙ্কুচিত হ'য়ে বসল কল্পনা। আমি তো বসলাম, কিন্তু তুমি ?

আমি দাঁড়িয়েই যেতে পারব এখন, তুমি বরং এক কাজ কর, সুটকেশটা তোমার কাছে নাও, হাতে ঝুলিয়ে দাঁড়ানটা বড় কষ্টকর।

ওদের দু'জনের দরকারী জিনিষগুলো ছোট সাইজের একটা ব্যাগে ঢোকান, ওজন হয়েছে কম নয়, রাখবার জায়গার অভাবে প্রকাশ এতক্ষণ সেটা হাতে ঝুলিয়ে রেখেছিল, অনেক সাধ্য সাধনা করে সেটাকে পিঠের কাছে রাখা হোল।

এটার তো গতি হোল, কিন্তু বিছানাটার ?

সেটাকে পায়ের ওপর কাৎ করে রেখেছি, ভয় নেই।

ভয় কি শুধু জিনিষটার জন্য, মানুষটার জন্যেও।

মানুষটা সুস্থ আছে, তা ছাড়া পায়ের উপর যে ভার চাপিয়েছি তাতে হঠাৎ ঝাঁকুনী লেগে পড়ে যাবারও ভয় নেই।

মাধ্যাকর্ষণের উপর আরও এক প্রস্থ ? অনেকদিন পরে মুক্ত-গলায় হেসে উঠল কল্পনা। বরং ওটার ওপর চেপে বসতে পার কিনা তাই দেখ।

বুদ্ধি দিয়েছ মন্দ নয়। দু-পাশের বেঞ্চির মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল প্রকাশ, এতক্ষণে বিছানাটা রাখল গাড়ীর গা ঘেঁসে, কোনমতে সেটার উপর চেপে বসল, মুখোমুখী হোল দুজনে।

যাক্ কথা বলবার সুবিধা হোল।

হঠাৎ ঝাঁকানীতে পড়ে যাবারও—গল্প করতে যেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যেয়োনা যেন।

গাড়ীতে অনেক জাতের যাত্রী—দেশী আছে, বিদেশী আছে। দেশীদের মধ্যেই বিভিন্নতা সবচেয়ে বেশী, একজনে বোঝে না আর এক জনের কথা, বাংলা, হিন্দি, ইংরাজি তাছাড়া উপভাষার মেশাল। বেশ একটা বিচিত্র সুরের সৃষ্টি হয়েছে।

অসুবিধাটা বাংলার কোমলাঙ্গীদেরই সব চেয়ে বেশী, ছেলেমেয়েও তাদের অনেকগুলি। পোঁটলা-পুটলী জিনিষপত্র, সব সামলাতে তাদের প্রাণান্ত হচ্ছে, হাতের সঙ্গে সঙ্গে মুখও চলছে মন্দ নয় কারণ জায়গা নিয়ে একটু-আধটু ঝগড়াও চলছে। যার যার সঙ্গী পুরুষটিও অন্যের ওপর বীরত্ব প্রকাশে কম যান না।

কল্পনার পাশেও বসেছে একটি ঘোমটা-টানা অল্প বয়সের বউ। অল্প বয়সের গুণেই হয়ত কথা বলছে সবচেয়ে কম কিন্তু ছটফট করছে বেশী। কল্পনার সিন্দুর-বিহীন সীমন্ত আর প্রকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবটা ওকে প্রলুব্ধ করছে কথা বলতে।

কোথায় যাচ্ছ ভাই তুমি? সে-ই প্রশ্ন করল, গলার শব্দকে একটু নীচু করবার চেষ্টা করতে করতে।

চাটগাঁয়ে—তুমি? প্রতি প্রশ্ন করল কল্পনা।

ওখানেই—আমাদের বাড়ী কিনা তাই! যুদ্ধ হবে হবে করে চলে

এসেছিলাম, কিছু হয়নি দেখে ফিরে যাচ্ছি আবার। তুমি যাচ্ছ কেন ভাই?

আমি যাচ্ছি বেড়াতে, তোমাদের দেশটা দেখে আসতে।

এখন আর কি দেখবে যেয়ে? দেখবার কিছু আছে না কি? কি যুদ্ধই যে বাধল ভাই? হুড়মুড় করে দেশশুদ্ধ লোক পালাল এদিক ওদিকে। ঘর-বাড়ী ভর্ত্তি করে সোলজার আছে শুধু, কিছু কি আর রেখেছে তারা? এই আমাদের বাড়ী, সারা চাটগাঁ টাউনে অমন বাড়ী নেই কিন্তু কি দশাই হয়েছে তার। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল মেয়েটি।

তা তোমরা যেয়ে থাকবে কোথায়? নূতন বাড়ী ভাড়া করে?

অগত্যা তাই। অসুবিধার আর অন্ত থাকবে না কিন্তু না যেয়েই বা উপায় কি? ওঁর কষ্টের সীমা নেই—অফিস আবার—

ওঁর মানে তোমার স্বামীর না? তাঁর আবার কষ্ট কিসের? তোমার জন্য মন কেমন করে বুঝি?

না তা কেন? অফিস করেন আবার বাড়ীর কাজ কর্ম্ম খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা, এত কি আর পারেন? তাই আমার যাওয়া নইলে অন্যসকলে এখন আসতে বারণ করেছিল।

কেন?

প্রায় ফিস্ ফিস্ করে সে উত্তর দিল—বড্ড উপদ্রব ভাই, মেয়েদের মান সম্মান রাখা দায়, বোঝই তো—তা আমি কতকটা নিজের ইচ্ছেয় চলে এলাম—কপালের লেখা যদি থাকেই, ভগবান রক্ষা করবেন।

তা-ও বটে। আত্মরক্ষায় যাদের উপায় নেই—অথচ প্রয়োজন বোধ আছে শারীরিক এবং মানসিক, ভগবানের ওপর নির্ভর করে

এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কি করতে পারে তারা ? পুরুষাকারের প্রশ্নই নেই এখানে, লাভ হলেও দৈবাৎ, লোকসান হলেও তাই। নির্ব্বিকারত্বই তো এদেশের চরম পন্থায় সুখী হবার শেষ উপায়। কল্পনা মুখ ফেরাল, ওর ঘুম এসেছে। ট্রেণের চাকায় বাজছে বুকের পাঁজরা পিষে যাবার ছন্দ, ঘস্‌-ঘস্‌, ঘস্‌-ঘস্‌, ঘস্‌-ঘস্‌। দেশের বুকের ওপর দিয়েও চলেছে বিদেশীর হাতে গড়া ঘর্ষণ যন্ত্র, বুকের হাড় পাঁজরা যাচ্ছে পিষে অব্যক্ত বেদনায়। ওদের চোখের পাতা ভারি হয়ে নামছে ঘুম, কঠিন আঘাতে হয়ত চেতনা জাগে কিন্তু কঠিনতম আঘাতে তারা যাচ্ছে আচ্ছন্ন হয়ে। দিন বয়ে চলেছে।

অনেক রাতে ওর ঢুলুনী বন্ধ হোল। উঠে এসো—প্রকাশ ওর বিনুনী ধরে টান মারল—কুম্ভকর্ণের মত ঘুমাও কেন খাস্তা ঘাটে ? ষ্টীমার ধরতে হবে না ? ঘুম ভাঙ্গাতেই এত দেরী এর পরে ষ্টীমারে জায়গা পাবে কেন ?

চমকে উঠে বসল কল্পনা। সত্যিই ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। প্রকাশটাই বা কেমন, একটু আগে থেকে ডাকতে ওর কি হয়েছিল—এখন এই ভীড় ঠেলে বেরুবে কি করে ? প্লাটফর্ম্মের দিকে একখানা মাত্র দরজা, প্রাণপণে মারামারি করছে সবাই একযোগে সেখান দিয়ে বাইরে যাবার জন্য।

বিরক্ত হয়ে উঠলো প্রকাশ—নাও বেরোও এখন এখান দিয়ে, তোমার কাণ্ড কারখানাই আলাদা।

ওর দুশ্চিন্তা অনুমান করে কল্পনার প্রায় হাসি পেল—চটছ কেন এই সামান্য কারণে ? যেতে যখন হবেই, বেরোতেও তখন হবেই, তার জন্য মেজাজ খারাপ কচ্ছ কেন ? চল বেরোনো যাক্‌।

বেরোবে কোথা দিয়ে, আমি না হয় জানালা দিয়ে নামতে পারি ; মোট দুটোও দেব এখন ফেলে কিন্তু তোমার কি উপায় হবে ? প্লাটফরম্ কত নীচুতে তাও জানা নেই, তা হলেও বা কিছু একটা হোত।

না জানা থাকলেও হবে—আমি আগে নামি জানালা দিয়ে, তার পরে ও দুটো ফেলে দিয়ে তুমিও নেমো। ব্যাস দু'মিনিটের ব্যাপার।

কোমরে আঁচলটা জড়াল কল্পনা, দস্তুর মত রণরঙ্গিণীর মত করে—তারপরে উঠল জানালায়, পরমুহূর্ত্তে নীচের অন্ধকারে।

আমি পৌছে গেছি প্রকাশ, এবার তোমার পালা। ব্যাগটা আর বিছানাটা ফেলে দিয়ে প্রকাশ লাফিয়ে পড়ল ঠিক ওর পাশে, —যাক্ নির্ব্বিঘ্ন, এবার চল দেখি কোন দিকে ষ্টীমার ঘাট।

ওদের কথাবার্ত্তা শুনে অন্ধকারের সঙ্গে মিলিয়ে এল আর একজন, --কুলি নেবেন বাবু ?

কুলি ? টর্চ্চ জ্বালিয়ে প্রকাশ তার মুখে ফেল্ল। রোগা, জিরজিরে কঙ্কালসার একজন লোক—বয়স তার কুড়িও হ'তে পারে চল্লিশও হতে পারে—সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে খানিকটা, দেখলে অনুকম্পা হয় মনে। তুমি নিতে পারবে ? আমার জিনিষ ভারী আছে।

না নিলে চলবে কেন বাবু! লোকটা যেন আর্ত্তনাদ করে উঠল—আমার যে মোটেই রোজগার নেই বাবু ? পশ্চিমে কুলিগুলো আগে আগেই সব মাল তুলে নেয়, আমি কি খাব বাবু ?

তাও বটে, এই ওর উপজীবিকা, সেও প্রায় বন্ধ হয়ে এল পশ্চিম প্রদেশবাসীদের সবল দেহের প্রতিযোগিতায়, আর নিজের দেশের লোকের অনুকম্পার অভাবে। অনাহার আর উপেক্ষা ওদের এই অবস্থায় এনে ফেলেছে আজও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে থাকে তাহলে ওদের কি উপায় হবে ?

আচ্ছা, তুমিই নাও তাহলে, ব্যাগটা আমিই নিচ্ছি বিছানাটা শুধু তুমি নাও, ওটা হাল্কা আছে। ষ্টীমার ঘাট কোন দিকে রে ?

এই, এই দিকেই বাবু, আমার ঠিক পিছনে আস্থন, উঁচুনীচু জায়গা মার হাতটা ধরে নেন বাবু নয়ত পড়ে যেতে পারেন।

পা টিপে টিপে চলছে ওরা। প্রকাশের হাতের মধ্যে কল্পনার হাত, সাধারণ মেয়ের মত নরম নয়, কঠিন সংগ্রামশীল সে হাত। বাঁ হাত দিয়ে টর্চ্চ জ্বেলে ধরেছে প্রকাশ; যা বিশ্রী রাস্তা লোকটা পড়ে যেতে পারে !

আলো জ্বালাবেন না বাবু, বারণ আছে, পুলিশে ধরে নেবে নয়ত। আমার রাস্তা চেনা—আমাকে দেখে দেখে আসেন বরং।

অনেক কষ্টে ওরা ষ্টীমার ঘাটে এসে পৌছল। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত, অন্ধকার নদীর জলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। তারই ওপরে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে ষ্টীমারখানা—ওর কাজ শুধু এপার ওপার করা।

কোনমতে উপরে ব'সে একটা জায়গা দখল ক'রে, সতরঞ্চি বিছিয়ে নিজের সীমানা নির্দ্দিষ্ট করে নিল কল্পনা।

তুমি এবার ঘুমিয়ে নিতে পার, রাত এখনও ঢের আছে।

মাঝ রাস্তায় ঘুমোবার সখ আমার নেই, দরকার থাকলে তুমি ঘুমোতে পারো। লোকটাকে বরং বিদায় করে দিই, ও যদি অন্য যাত্রী আনতে পারে।

এক টাকার একখানা নোট গুঁজে দিল প্রকাশ ওর হাতে, একবেলা অন্ততঃ পেট ভরে খেতে পারবে ওরা।

আর কোন কাজ নেই বাবু ?

আর কি কাজ থাকবে বল ? খাবার-টাবার পাওয়া যায় কিনা কোথাও জানো ?

হোটেল আছে এই দিকে—অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে আঙুল দেখাল লোকটা—কিন্তু জিনিষপত্রের বড় দাম, তাছাড়া খাবারও বোধ হয় পাওয়া যাবে না, গাড়ীভর্ত্তি সোলজাররা খাবে এখন।

খাবারের দোকান নেই কোথাও? ফলটল পাওয়া যায়?

যেত সব আগে কিন্তু ওরা জোর করে খেয়ে পয়সা দেয় না বলে বিক্রী বন্দ হয়ে গিয়েছে। সকালের দিকে চিঁড়ে মুড়ি ফেরী করে, ততক্ষণ জাহাজ না ছাড়লে কিনে নেবেন।

আর কিছু জানবার নেই দেখে প্রকাশ ওকে বিদায় করে দিল, ততক্ষণে কল্পনা হাত পা ছড়িয়ে টান্ হয়ে শুয়ে পড়েছে দেখেই প্রকাশের পিত্তি জ্বলে গেল, দোহাই তোমার আর ঘুমিও না। চোখ মেলে বরং দেখো, নূতন দেশে চলেছ ভাববার মত, দেখবার মত এখানেও অনেক কিছু পাওয়া যাবে।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু দেখব কি করে? যা অন্ধকার।

তাতে কিছু এসে যাবে না, তিনটে বেজে গেছে, ঘণ্টা দুইএর মধ্যে ফর্সা হয়ে যাবে এখন।

পেছনে ফেলে আসা যাত্রীদল, চিটাগাং যাত্রী সৈন্যদল সব ততক্ষণে এসে হাজির, মিনিট খানেকের মধ্যে ভরে গেল সমস্ত ষ্টীমারটা, চেঁচামেচিতে ভরে উঠল সব জায়গাটা।

ও মশাই, একজন কনুইয়ের গুঁতো দিল কল্পনার কাঁধের কাছে, খুব লম্বা হইয়া শুইয়াছেন যে—অত আরামে কাজ নাই উঠ্যা বসেন।

ধাক্কা খেয়ে কল্পনাও বিরক্ত হোল দস্তুরমত। এক ইঞ্চিও না নড়েই উত্তর দিল শক্ত করে,—জায়গার দরকার থাকে, রিজার্ভ করে

ষান, অসভ্যের মত গায়ে ধাক্কা দেন কেন? মুখ নেই ভদ্রভাবে কথা বলবার জন্যে?

পুরুষমানুষ মনে করেই হয়ত ধাক্কাটা দিয়েছিল কিন্তু উল্টোটা দেখেও ভদ্রলোক দমল না, ইঃ নিজে যেন জায়গা রিজার্ভ কইরা যাইতে আছেন। ভাল চান তো উঠ্যা বসেন, নয়ত দিলাম আর এক ধাক্কা অপমান হইতে না চান তো উঠ্যা বসেন।

প্রকাশ এতক্ষণ কথা বলেনি, এইবার সোজা হয়ে বসল, রাগে, অপমানে, সমস্ত শরীরটা ওর শক্ত হয়ে উঠেছে। কি বলতে চান আপনি? সরবে না ও জায়গা থেকে, শক্ত হাতে ওর কাঁধ ধরে প্রকাশ ঝাঁকানী দিল—প্রয়োজন হয় ভদ্রভাষায় অনুরোধ না করে আগেই মেয়েদের গায়ে হাত দিলেন যে? দেখি কত বড় ধাক্কা দেবার শক্তি আছে। শিশুর মত দু'হাতে উঁচু করে ধরল ওকে, নীচেই বয়ে যাচ্ছে অতলস্পর্শী গভীর পদ্মা মেঘনার মিলনস্থল।

মাফ্ করেন মশয়, ফেলবেন না। আমার পোলাপান আছে মশয়, বুড়ো মা আছে, বউ আছে, খাইবার জোটপে না মশয়, মাফ্ করেন মশয়, বুঝতে পারি নাই।

বুঝতে পারনি? রাগ চড়ে গেল প্রকাশের—তোমার ঘরে মা আছে বোন আছে আর এঁর ঘরে ভাই নেই—সন্তান নেই? তুমি তো শিক্ষিত ভদ্রলোক—চেপে ধরলে যে জ্ঞান বেরোয় আগে বেরোয় না কেন? বাঙালী ছেলের পক্ষে বাঙালী মেয়েকে ধরে অপমান করাটা কি খুব বড় একটা পৌরুষের কাজ?

লোকটা সমানে কাকুতি মিনতি করতে লাগল। অবশেষে বিরক্ত হয়ে কল্পনাই কথা বল্লে—ছেড়ে দাও, ওর মত একটা জন্তুকে শাস্তি দিয়ে লাভ কি? উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া স্বভাব ওদের

বদলাবার জন্যে নয়—ওদের জন্য নিজেদের ব্যস্ত করাটাও অপমানের।

ছেড়ে দিতেই লোকটা ভিড় ঠেলে কোথায় সরে পড়ল তার কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না। আশে পাশে দাঁড়িয়ে যারা মজা দেখছিল তারাও এদিকে এগুবার লক্ষণ দেখাল না। গোঁয়ারগোবিন্দ লোকটার গায়ের জোরের পরিচয় পেয়েছে তারা।

নির্ব্বিবাদে অনেকখানি জায়গা দখল করেই ওরা বসে রইল পা ছড়িয়ে। নিজেদের সীমানাটা একটু ছোট করে নেব নাকি প্রকাশ? বাস্তবিক ভীড়টা বড় বেশী, হয়ত ওদের কষ্ট হচ্ছে।

হয়ত কেন নিশ্চয়ই হচ্ছে—কিন্তু তার জন্য অকারণ ব্যস্ত হ'তে হবে না, ওরা এমন ভাবেই যেতে অভ্যস্ত, হাজার অসুবিধা হলেও ওরা সুবিধা ক'রে নিতে জানে না, এ তারই প্রায়শ্চিত্ত।

চাটগাঁয়ে বেড়াবার সখ ওর দু'দিনেই মিটে গেল, ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠল কল্পনা। এখানে এসে আর নূতন কি দেখল শুনি? ঘরে ঘরে সেই অন্নহীন বস্ত্রহীন জনতার পুনরাবৃত্তি, শেষ সম্বল করে ধরা হয় নারীদেহের প্রতি পুরুষের আসক্তিকে। অন্ধকারে গা ঢেকে চলেছে ব্যবসাদারের আনাগোনা, কলকাতারই পুনরাবৃত্তি চলেছে ফের।

প্রকাশেরও কাজ মিটে গিয়েছে, ফিরে যেতে তারও অনিচ্ছা নেই। এমনিতেই ঢের দেরী হয়ে গেছে, কল্পনা স্কুল ছেড়ে বসে আছে আজ মাস দুই—এর মধ্যে কাজ জুটল না কোন। ঘর ভাড়া দিতেই কুলোয় না, এর ওর কাছে ক্রমশঃ ধার বেড়ে চলেছে, কি করে চলছে যে দিন!

কিন্তু শিলং যাওয়াও একবার দরকার, কথা দিয়েছিলে তাদের—প্রকাশ বল্লে।

চুলোয় যাক্ শিলং, অত গাড়ীভাড়া আসবে কোথা থেকে, ফিরেই যাই চল, যেয়ে না হয় চিঠি লেখা যাবে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়াতে যাওয়া হল না।

তাই হোল, দুজনে ফিরে এল কলকাতায়, বস্তির ধারের সেই নোংরা ঘরটিতে।

বাঁচলাম বাবা, কল্পনা পা ছড়িয়ে দিল খাটিয়াটার ওপর—যাই বল, নিজের ঘর দোর, নিজের মত করে গুছানো দিনগুলোর মধ্যে যেমন স্বস্তি বোধ হয় এমনটি আর কোথাও নয়। আমার সামান্য এই ঘরটাই মনে হ'চ্ছে কত আরামের!

তা—বটে।

শুধু তা বটেই নয়, আরও অনেক কিছু। জননী জন্মভূমি আমার দেশকে না বলতে পারলেও চেনা পরিচিত সকলের কাছ থেকে তাড়া খেয়ে যখন এখানে এসে মাথা গুঁজি তখন আমার তো বাপু, একেই স্বর্গাদপি গরীয়সী বলে মনে হয়।

হওয়া কিছু অন্যায় নয়, কিন্তু আমি ভাবছি একে তোমার ছাড়তে যদি হয় কি কষ্টটাই না হবে।

কক্ষণো না, বাড়ী আমি বদলাচ্ছি কিনা।

তুমি না বদলাও, ভাড়াটে বদলাতে বাড়ীওয়ালা তো চাইছে।

কক্ষণো নয়, আমার অপরাধ?

অপরাধ দু'মাস বাড়ীভাড়া বাকী ফেলেছ, বেচারা যে বাড়ীভাড়া দিয়েই খায়।

মুহূর্তে কল্পনার মুখখানা ম্লান হয়ে এলো। তা হলে কি হবে বলত? আজ অবধি যে একটা চাকুরী জোটাতে পারলুম না।

ঘরে বসে থাকলে জুটবে কি করে? যদি চাকরীই করতে চাও তাহ'লে খোঁজ কর য়্যাপ্লিকেশন হাতে করে—এখানে ওখানে চেষ্টা করতে থাক।

তার মানে?

তার মানে অত্যন্ত সোজা। তোমার এমন কিছু ব্যাকিং নেই, যার জোরে ঘরে বসে তোমার চাকরী হবে, ডাকে যে গাদা গাদা য়্যাপ্লিকেশন পাঠাচ্ছ, তা যথাস্থানে টান মেরে ফেলে দেয়। কাজেই নিজে যেয়ে দেখা করে চেষ্টা করতে থাক, কপালে থাকলে যেখানে হোক্ একটা লেগে যাবে।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু যেয়ে বলতে হবে চাকরী দাও ?

এবং দরকার মত কাকুতি মিনতিও করতে হবে।

সে আমি পারব না, বরং—

বাধা দিল প্রকাশ, না খেয়ে মরবে এই তো? কিন্তু তা পারবে না, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, তা ছাড়া বাড়ীভাড়া দিতে পার— —মরবার আগেই দেবে রাস্তায় বের করে সুতরাং—

একবার বেঁচে থাকবার চেষ্টা করতে হবে—বেশ তাই। কল্পনা উঠে পড়ল।

ওকি, আবার এক্ষুনি চললে কোথায় ? আজ যে রবিবার সব জায়গা বন্ধ তা খেয়াল আছে ?

জানি, সেই জন্যেই তো উঠলাম, রবিবারের কাগজে Situation vacant এর খবর থাকে বেশী, আজকে য়্যাপ্লিকেশন কটা লিখে রাখি।

কাগজ আছে ?

আছে, কাগজওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে সকালবেলা দিয়ে যায় আর দু'ঘণ্টা বাদে নিয়ে যায়—আধাআধি বন্দোবস্ত, আমার লাভ হয় কারেণ্ট টপিকগুলো জানতে পারি, ওর লাভ দেড়া দাম।

অমৃতবাজারের পাতা ওল্টাতে লাগল কল্পনা—Wanted a Nurse, কোয়ালিফিকেশন নেই, আচ্ছা Chemist এটাও যাক্। Officer, Designer এগুলো তো হবেই না। আচ্ছা ক্লার্ক চেয়েছে সাপ্লাইতে আর টিচার চেয়েছে কল্যাণী বালিকা বিদ্যালয়ে।

আচ্ছা এক কাজ করি না কেন ? দু'জায়গাতেই দরখাস্ত দিই, একটা না একটাতে লেগে যাবে। তোমাদের অফিসে লেডি ক্লার্ক নেয় না প্রকাশ ?

প্রকাশ ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসল একটু—চাকরী অত সহজে হয়না রাম্নু, বুঝলে? আমার অফিসে নিলেই কি তোমার হত মনে কর? তোমার যেটুকু ব্যাকিং আছে তার চেয়ে ঢের বেশী ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাকিংশুদ্ধ ক্যানডিডেট আছে তা জান?

কি করে জানব? আমার ধারণা ছিল, এপথে আমিই প্রথম পথিক, কারণ আমার ইচ্ছামত চলতে বাধা দেবার কেউ নেই এবং যেখানে মেয়েদের চাকরী করাটাই ভীষণ একটা আপত্তিকর ব্যাপার, সেখানে আবার আপিসে?

আপত্তি থাকতে পারে কিন্তু অভাবও যে' প্রচণ্ড—চাকরী না করে কি করবে বলত?

তা বটে, মেয়েদের না-করা এমন কি আর বাকী আছে? কন্‌ট্রোলের লাইন, চাকরী, আরও কত কি, আচ্ছা প্রকাশ—

কি?

ধর যদি চাকরী হয়, তা হলে তো মিটেই গেল, কিন্তু যদি না হয় তা হলে কি হবে বলত? বাড়ীর সঙ্গে রাগারাগি করে চলে এলাম, তাদের কাছে সাহায্য চাইতে আমি পারব না, আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব বলতে কেউ নেই, থাকলেই বা কি, তাদের কাছে মাথা হেঁট করতে পারতাম?

কিন্তু আমার কাছে তো পারছ?

তা পারছি কিন্তু···

কিন্তু কি···

কোথায় যেন একটু বাধ বাধ লাগে তোমার কাছেই বা ঋণী হয়ে রইলাম কেন? আমারও শিক্ষা আছে, কর্ম্মশক্তি আছে, তবু

তোমার বোঝা হয়ে রইলাম কেন? অথচ এ শোধ দেবার শক্তি বা ইচ্ছা কোনটাই আমার নেই।

শক্তি না থাকতে পারে, ইচ্ছা নাই কেন? প্রকাশ, হঠাৎ কল্পনা ওর হাত চেপে ধরল—এটুকু আমার দুর্ব্বলতা, এই আমার নিজস্ব যা তোমাকে দান করতে পারি, উপহার দিতে পারি। আরও অনেক কিছু—হয়ত একদিন ছিল কিন্তু জীবনপথে এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে সব গেছে ছড়িয়ে—এটুকু আর আমি ফিরিয়ে নিতে চাইনে—এ তোমারি থাক্।

এই আমার সবচেয়ে গর্ব্বের জিনিষ যে তোমার আপন হাতের দান নেবার যোগ্যতা আমি অর্জ্জন করেছি। কিন্তু এছাড়াও যদি চেয়ে নেবার কিছু থাকে—তাহলে কি ফিরিয়ে দিতে পারো?

কি চাও বল?

কি চাই? প্রকাশ ওর সামনে এসে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ওর দুই চোখের দিকে—জানো আমি মানুষ, আমার সমস্ত দেহে বয়ে চলেছে আশা আনন্দ কামনায় ভরা জীবন্ত রক্তস্রোত। তারা চায় তোমাকে, আমার সারাজীবনের সঙ্গিনী করে আমার নীড় রচনার স্বপ্নের সহচারিণী করে। তুমি কি ধরা দেবে না?

এক মুহূর্ত্ত—কল্পনার মুখেও উত্তর বেধে গেল—এ কামনা কি শুধু পুরুষের? নারীর নয়? গৃহরচনার স্বপ্ন কি শুধু তাদেরই?

রানু—

কি?

ঐশ্বর্য্য তোমায় দিতে পারব না। সুখ, বিলাস পাঁচজনের কাছে সম্মান এও তুমি পাবে না আমার দরিদ্র উপকরণ থেকে। কিন্তু

তোমাকে দেখিয়ে দেব পথ—আমার দুঃখবেদনায় ভরা কঠিন জীবনের সমান অংশ নিয়ে চলতে হবে তারি উপর দিয়ে—দুঃখ জয়ের সাধনা, এ তুমি গ্রহণ করবে কি ?

দুঃখের দিনের সঙ্গী প্রকাশ, কল্পনার হাতের বাঁধনে কঠিনতর হয়ে উঠল সে।

প্রকাশ—

কি ?

সম্পদের উপর আমার কোন আকর্ষণ নেই, তা জানো ?

জানি, জানি বলেই তো ডাক দিয়েছি আমার পথে, তোমার কোন বাঁধন নেই—আমারও শেষ আশা নূতন সমাজ সবল মানুষ গড়ে তুলবার ভার তো আমাদেরই। আমরা দেখিয়ে যাব পথ, সে পথ দিয়ে চলবে আগামী দিনের মানুষ—এর চেয়ে মহৎ কাজ আর কোথায় মিলবে আমাদের বলতে পারো ?

কিন্তু—

কিন্তু না রানু, জানি আমি দরিদ্র। পুরুষানুক্রমে জমে ওঠা অভাব, দারিদ্র্য, ব্যাধি—এর মধ্য দিয়ে স্বাধীন হবার, মানুষ হবার, বড় হবার ব্রতই আমাদের ; যত দুঃখ আসুক, যত লাঞ্ছনা আসুক—আদর্শ থেকে বিচ্যুত হব না কিছুতেই। গতানুগতিক ভাবে পুরুষানুক্রমে অভিশপ্ত জীবনের উত্তরাধিকারিত্ব করবার জন্য মানবের সৃষ্টি নয়—আমরা মানুষ—মানুষের পরিচয় দেবার মত প্রাণ গড়ে তুলব—সেই ব্রতের সঙ্গিনী তুমি। তোমার শিক্ষা আছে, শক্তি আছে, অভিজ্ঞতা আছে আর আছে হৃদয়—এর চেয়ে কামনার জিনিষ পুরুষের তো নেই।

হীরার মত উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে কল্পনা প্রকাশের মুখের দিকে পরিপূর্ণ ভাবে চাইল, দুহাতে চেপে ধরল ওর হাত—তুমি তো জানো, সংসারে

একা তোমারি কাছে আমি করেছি মাথা নত। কতটুকু আর আমাদের এই ঘর ? এর চেয়েও বড় ঘর আমাদের দেশ। আমাদের হীনতা, আমাদের বংশগত লজ্জা থেকে মুক্ত হবার সাধনা তোমার, এ পথে আমি ছাড়া আর কে চলবে তোমার সঙ্গে ? সেই পথেই তো আমি তোমার বন্ধু, তোমার সহকর্মিণী, তোমার সঙ্গিনী—এতে তোমার স্বপ্ন সার্থক হবে কি ?

দু'হাতে তুলে ধরল প্রকাশ ওর মুখ, সুন্দর নয়, প্রাণ-প্রাচুর্যে ঝলমল করা ওর মুখ—অনুরাগে রাঙা হয়ে উঠেছে—ওর চোখের কোলে স্বপ্নের আবেশ, তার সঙ্গে আছে নির্ভর করার দৃঢ় সংকেত—একেই তো সে কামনা করেছে, স্বপ্ন দেখেছে, ভালবেসেছে। ধীরে ওর মুখ নত হয়ে এল।

স্কুলের চাকরীর আশা ছেড়ে দিয়েছে কল্পনা, নবাবগঞ্জের অভিজ্ঞতা, পাণিহাটির ইণ্টারভিউ, অবশেষে নন্দিতা বিদ্যালয়ের বিবেচনায় তিনমাসে চৌদ্দ টাকা। নাঃ বড় একটা আইডিয়ালকে কাজে করে তোলার সৌভাগ্য তার অদৃষ্টে লেখা নেই—সম্মানের চাইতেও ওর বেশী প্রয়োজন ডালভাতের এবং রবাহুত, অনাহুতদের আহ্বান থেকে উদ্ধার পাবার জন্য একখানি ঘর। অবশ্য বাবার আশ্রয় না ছাড়লে এ কথাগুলো হয়ত এত তাড়াতাড়ি ভাবতে হোত না কিন্তু সে ভরসাই বা ক'দিনের? বাধ্য মেয়ের মত ঘরে বসে থাকলে ক'দিনের জন্যই বা নিশ্চিন্ত হ'ত সে? অনেকগুলো মেয়ের বিয়ে দিতে দিতে বেচারী ভদ্রলোকের সারাজীবনের উপার্জ্জন প্রায় বই খরচ হ'য়ে গেছে—শুধু মেয়ের বিয়ে দেওয়াই তো আর শেষ কথা নয়! অন্ততঃ আরও দশটা বছর যদি বেঁচে থাকেন, খরচ করে খেতে পরতেও তো হবে? তাছাড়া দু'তিনটি ছেলের সংস্থান করে দেওয়া দরকার। কল্পনা বাদে আরও দু'টি মেয়ে আছে তাঁর। ওদের মধ্যে সেই একটু লেখাপড়া শিখবার সুযোগ পেয়েছে, আর কতদিন তাঁর গলগ্রহ হয়ে বেচারীর দুশ্চিন্তা বাড়ান যায়? ছেলে হ'লে আজ তাকেই সংসারের ভার নিতে হোত—বরং মেয়ে হ'য়ে সে দায় থেকে বেঁচে গিয়েছে। অবাধ্য মেয়ের উপার্জ্জনের অংশে ভাগ বসাবার মত মনোভাব তার বাপ-মায়ের নেই।

বিয়ে একটা? হয়ত শেষ সম্বল ঘুচিয়ে দিতে পারতেন, চেষ্টাও করেছিলেন কিছু কিছু কিন্তু সে পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়াল সে নিজেই।

নাই বা হোল বিয়ে, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা তারও আছে। অন্যের সাহায্য সে নেবে কেন? তার নিজেরই যে অন্যকে সাহায্য করবার ক্ষমতা আছে, আর সেই জন্যেই সে চলে এসেছে কলকাতায়—তার শিক্ষা আছে, কালচার আছে, ইউনিভারসিটির ডিগ্রী আছে, সবার চেয়ে বড় কথা তার স্বাস্থ্য আছে, শাণিত লোহার মত পিটে তোলা স্বাস্থ্য। বাঙালী সংসারে যা একান্ত দুর্লভ সেই অনমনীয় মনের জোরও আছে তার তবে কেন পথ চিনে নেবার শক্তি হবে না?

নিজের দেশের মাটিতে সবল হয়ে দাঁড়িয়ে, আকাশে মাথা তুলে বাঁচবার যোগ্যতা তার আছে—তবে কেন অন্যের সুখের দিকে চাইবে সে?

বাবার সংসারেই বা কদিন মাথা গুঁজবার জায়গা হোত? একদিন না একদিন বিদায় যখন নিতেই হত, তখন কর্ম্মক্ষম শরীর ও মন থাকতে থাকতে নেওয়াই ভাল, ততদিনে বরং অন্য রাস্তা খুঁজে নেওয়া যাবে।

হিজিবিজি ভাবছে কল্পনা। এই তো এই ছোট্ট ঘরের কোণটুকুই তার মাথা গুঁজে থাকবার সম্বল। প্রকাশের মেসে ফিরে যাওয়া চলে না, অথচ দু'জায়গার খরচ চালাবার মত শক্তি দু'জনের কারো নেই। ঘরভাড়া বাকী পড়েছে—কি উপায় হবে ওর?

ছোট্ট আর্শীখানা তুলে ধরল কল্পনা। কদিনই বা সে এখানে এসেছে? এর মধ্যেই চোখের কোণে পড়েছে কালীর দাগ, সামনের দিকের চুলগুলো গেছে উঠে, বহুদিনের পুরানো চশমার ফ্রেমে বাঁধতে হয়েছে সুতো, গলার হাড় উঠেছে ঠেলে।

মধ্যে মধ্যে ক্লান্তি আসে·········

সকালবেলা বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করে না। ভারি তো বিছানা,

একখানা সতরঞ্চর ওপর মোটা ধরণের চাদরের পরে [illegible] একটা বালিশ আর গায়ে দেবার জন্য খদ্দরের একটা চাদর, এই তো তার সম্বল—তবু ওরই মায়ায় অনেকক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকে।

ভোরের আলো মিলিয়ে আসে প্রখর রৌদ্রে, বড় রাস্তা থেকে শোনা যায় ট্রামের ঘর্ঘর শব্দ, জনতার কোলাহল।

মোটা চালের ভাত আর আলুসিদ্ধ, কচুসিদ্ধ—উঠে বসবার মত শক্তি আস্তে আস্তে যাবে নিঃশেষ হয়ে। চলতে চলতে বাইরের বুভুক্ষু মিছিলের সঙ্গে ও-ও একদিন পড়ে যাবে পথে আর উঠবে না, বেঁচে থাকার সংগ্রামের শেষ পরিণতি!……এই সময়ে যদি কেউ প্রলোভন এনে ধরে ওর সামনে সুখের, স্বচ্ছলতার………উঃ মাগো।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো প্রকাশ, হন্তদন্ত চেহারা—একি এখনও শুয়ে?

উঠে বসল কল্পনা—কি আর করি। হাতে তো আর কাজ নেই কিছু, শরীরকে সুস্থ রাখাই এখন সবচেয়ে প্রধান কাজ।

তাতো বুঝলাম, কিন্তু শরীরচর্চ্চা ছেড়ে এবার উঠে বসো, পেটের চিন্তা করা যাক্—

ওতো সারাদিনই করছি, আর দরকাই নেই।

নাও অত হতাশ হতে হবে না, সুখবর এনেছি।

বেশ বলে ফেলো।

সাপ্লাইতে আমার চেনা একটি ছেলে কাজ করে জা[illegible] তার মুখেই শুনলাম, অনেকগুলো লোক নেওয়া হচ্ছে, তুমিও একবার ট্রাই করে দেখো।

ও হবে না, দু'বার ইণ্টারভিউ দিয়েছি।

বেশ তো, আর একবার যাও, নিজেই চলে যাও একটা য়্যাপ্লিকেশান হাতে করে। আমি সেই ছেলেটির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবো। তারপর সে-ই তোমাকে য়্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসরের কাছে নিয়ে যাবে। তাঁকে যদি একটু জোর করে ধরতে পার, তাহলে হয়ে যাবে তোমার কাজটা।

দু'মিনিটেই কাপড় বদলে নিল কল্পনা—শেষ সম্বল হাল্কা রঙের একটা মিলের শাড়ী সাদা ব্লাউজ পরে। পাতলা চুলে সোণালী ফিতে বাঁধা বেণী, গায়ে মাখবার সাবানের অভাবে কাপড় কাচার সাবানটা দিয়েই চলেছে হাতমুখ পরিষ্কার করবার কাজ, ছেঁড়া জুতোটায় পড়েছে তালি। তবু স্মার্ট, আধুনিকা, শিক্ষিতা তরুণী কল্পনা, কোয়ালিফিকেশনের বাজারে ওর দামই বা কম কিসে?

এসপ্লানেডের কাছে ট্রাম থেকে নামল দু'জন, অল্প একটু হেঁটে যেতে হবে।

এধারটা একরকম বিদেশী উপনিবেশে বদলে গিয়েছে। দেশী লোকের আনাগোনা কেবলমাত্র অফিস টাইমে, প্রয়োজন বোধে। দলে দলে চলেছে বিদেশী; সকলের সঙ্গেই সুবেশা সুন্দরী তরুণী, অর্থের অপ্রাচুর্য্য এবং দুর্ভিক্ষের ছোঁয়াচ ওদের কোথাও পড়েনি, না শরীরে না মনে। হাসতে হাসতে চলেছে ওরা, পায়ে পায়ে বাজছে হাই হিলের —ওদের চলার সঙ্কেত।

এদিকটা সাজানও সুন্দর করে। চকচকে রাস্তা, বড় বড় বাড়ী, চমৎকার করে সাজান দোকানগুলো, সার দিয়ে চলেছে ট্যাক্সি, ট্রাক, লরি, মোটর বাইক আরও কত কি। পেট্রোলের অভাব শুধু বাঙালী পাড়ায়। ফেরীওয়ালাগুলোও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন-ভদ্রতার ছোঁওয়া লেগে পরিণত, ফিটফাট চালচলনে। সার দিয়ে সাজান আপেল, কমলানেবু,

দড়ি টানিয়ে ঝুলিয়ে রাখা আঙুর, কলা, আরও কত কি। অনেকেই কিনছে, দরদাম করবার দস্তুর এখানে নাই। পকেট থেকে যা উঠছে তাই দিচ্ছে ফেলে।

কল্পনাকে ওদের দিকে চাইতে দেখে প্রকাশ হাসল,—ওদিকে তাকিও না, ওসব দেবভোগ্য জিনিষ, আমাদের জন্য নয়। একটা কলার দামই ছ'আনা দশপয়সা হবে।

তা বটে, কল্পনা উত্তর দিল, আমাদের প্রয়োজন শুধু উৎপন্ন করবার সঙ্গে, ভোগ করবার জন্য নয়।

ভোগ করতে হ'লেও প্রয়োজন শক্তির, আমরা অক্ষম এবং দুর্ব্বল বলেই শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি লুণ্ঠন হয়ে যাওয়া......... আর দোষ দিই অদৃষ্টের। সে যাক্, এসে গেছি। মস্ত একটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকল সে—তুমি একটু দাঁড়াও, মুখার্জ্জিকে ডেকে আনি।

একটু পরেই প্রকাশ ফিরল, সঙ্গে আর একটি ছেলেকে নিয়ে। পরিচয় দেবার দরকার হবে না। ওকে দেখেই কল্পনা চিনতে পারল, এই নীলাম্বর মুখার্জ্জিই প্রকাশের অখ্যাতনামা বন্ধু এবং তার চাকরী খোঁজা সমস্যার প্রধান সমাধান হতে পারেন।

ভদ্রতাসঙ্গত নয়, তবু কল্পনা ওর দিকে ভাল করে না তাকিয়ে পারল না। চেহারা মন্দ নয় ছেলেটির, লম্বা, ছিপছিপে গড়নের, দামী ছাই রঙ্এর স্যুট পরনে, মানিয়েছে চমৎকার। একরাশ চুল সযত্নে ব্যাকব্র্যাশ করা। ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখে গভীর ভাবে চেয়ে দেখবার শক্তি লুকিয়ে আছে। খাড়া নাকের নীচে সুকুমার অধর দুখানি একটু বেমানান, সমস্ত মুখে সযত্নে প্রসাধনের চিহ্ন আঁকা, মেয়েদের মত লাবণ্যে ভরা। কপালের লম্বা কাটা দাগটি ঈষৎ লাম্পট্যের ছায়ার সঙ্গে তাল বজায় রেখেছে যেন।

আপনিই মিস্ রয়? খুব স্মার্টনেসের পরিচয় দেবার মত অভিবাদন জানাল—এর আগে এখানে য়্যাপ্লিকেশান করেছেন কি?

হ্যাঁ করেছি, ইণ্টারভিউও পেয়েছিলাম দু'বার—সহজ গলায় কল্পনা জানাল।

I wonder, বেশ জোর দিয়ে বল্লে নীলাম্বর—কিন্তু এই হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল; ব্যক্তিগত qualificationএর প্রশ্ন ওঠেই না, যার যত ব্যাকিং she is the gainer. তা দেখুন—আমি আপনাকে একজনের সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছি—তিনিই আপনাকে সার্ভিসে ঢুকিয়ে নিতে পারবেন।

প্রকাশের দেরী হয়ে যাচ্ছে, টিফিন টাইম তো অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে সে আর দাঁড়াল না,—আমি তা হলে চলি, আপনি প্লীজ ওকে একটু গ্যালিফ ষ্ট্রীটের ট্রামে তুলে দেবেন।

O, yes, নীলাম্বর বল্লে—ভাববার কিছু নেই—এঁকে বাড়ী পৌছে দেবার দায়িত্ব আমার।

প্রকাশ চলে গেল কল্পনাও নীলাম্বরের পিছু পিছু এলো—ট্রামলাইন পেরিয়ে চৌরঙ্গীর দিকে বোধ হয় এদের অনেকগুলো ব্রাঞ্চ আছে।

আসুন মিস্ রয়—একখানা প্রাইভেট কারের দরজা খুলল সে, আপনাকে আমাদের নিউ ব্রাঞ্চ দেখিয়ে আনি, ট্রামের ভীড়ে আপনার যেতে কষ্ট হবে।

বিনা আপত্তিতে কল্পনা উঠে বসল। অচেনা, অজানা লোকের সাথে যেতে যতটুকু সংস্কারে বাধে সেটুকুর বালাই ওর নেই, নিজের ওপর বিশ্বাস ওর যথেষ্ট। হাতের কসরৎ পর্য্যন্ত দেখাতে হয় না, একটু ট্যাক্‌টিক্‌স জানা থাকলেই হল।

চা খাবেন? নীলাম্বর ড্রাইভারের সিট-এ বসে পেছন দিকে চাইল, —আপনার আপত্তি নেই তো? আমি এই সময় লাঞ্চ খেয়ে থাকি।'

বেশ তো আপনি খেয়ে আসুন—কল্পনা হেসেই বল্লে, আমি তো চা খাই না, বিশেষ রেষ্টুরেণ্টে, সুতরাং আমার যাবার দরকার হবে না।

সে কি? এ সব বিষয়ে গোঁড়ামি আছে নাকি এখনও?

গোঁড়ামি না থাকাটাই কি ভাল? হাজার জনের খাওয়া প্লেট হয়ত ওরা পরিষ্কার করে ধোবার সময় পর্য্যন্ত পায় না। আমার সিম্‌পলি ভালই লাগে না।

নিস্তেজ হয়ে এলো নীলাম্বর, তবু হাসল লজ্জিত ভাবে—হেলথের দিক দিয়ে উচিতও নয় কিন্তু আমরা না খেয়ে পারি না কারণ সারাদিন বাইরেই কাটাতে হয়, ঘরের খাবার আর পাচ্ছি কোথায় বলুন?

সে তো নিশ্চয়ই—কল্পনা ওর কথায় সায় দেবার চেষ্টা করল, উপায় তো নেই, আপনি বরং খেয়ে আসুন আমি ততক্ষণ বসেই থাকি।

নীলাম্বর আমতা আমতা করে কি যেন বলবার চেষ্টা করল কিন্তু কল্পনা সেটাকে আমল না দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরাল। বাধ্য হয়েই ওকে উঠে যেতে হোল, চলন্ত জনতার সঙ্গে মিশে যেতেই কল্পনা ফের এদিকে ফিরল—অভিজ্ঞতা হচ্ছে মন্দ নয়। চাকরীর জন্য খোসামোদ করতে এসে সেই পেয়ে গেল নিমন্ত্রণ—দেখা যাক শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায়!

হয়ত একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল সে, চমকে উঠল নীলাম্বরের গলার শব্দে—মিস্ রয়, Here is the hero.

কল্পনা মুখ ফেরাল ওর দিকে—সঙ্গে লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ গড়নের আর একজন স্যুট পরা ভদ্রলোক—মুখের ভাবে অবাঙালী বলে মনে হয়।

মিঃ ভায়ালকা—গদগদ স্বরে নীলাম্বর বলে চল্ল—পার্সনাল ফ্রেণ্ড অফ্ আওয়ার সেক্রেটারী, চেহারা দেখেই বুঝছেন বাংলা দেশের লোক নন উনি। পাঞ্জাব ছাড়া এমন স্বাস্থ্য এদেশে কোথাও পাবেন না, গর্ব্বিতভাবে হাসল সে, যেন কৃতিত্ব তারই। আপনাকে প্রভাইড করতে পারবেন এমন সোর্স আছে ওঁর।

হাত তুলে নমস্কার জানাল কল্পনা। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় তিনি কি বললেন তা সে বুঝতে পারল না—জিজ্ঞাসুভাবে নীলাম্বরের দিকে চেয়ে রইল।

ওদের দুজনের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা চল্ল—দোভাষীর কাজ করল বাংলার দুলালটিই। দেখুন মিস্ রয়, উনি বলছেন সাপ্লাইতে লোক নিচ্ছে বটে কিন্তু লেডি রিক্রুটমেণ্ট আপাততঃ বন্ধ—তা আপনি অন্য কাজ করবেন?

কাজ আবার কে না করে, বিশেষতঃ ওর মত অবস্থায় পড়ে? কল্পনা উত্তর দিল, কাজের জন্যই তো আপনার সঙ্গে পরিচয় তা অন্য কাজটা কি তাই বলুন আগে।

কাজের পরিচয় দিতে ওর মুখে আটকাল না একটুও, কাজটা হচ্ছে প্রাইভেট সেক্রেটারীর—মিঃ ভায়ালকার একজন য়্যাসিষ্ট্যাণ্টের দরকার, ওঁর সমস্ত কাজে হেল্প করবার জন্য।

কি ধরণের কাজ?

ধরুন···চিঠিপত্রগুলি কপি করে দিলেন, ইম্পর্ট্যাণ্ট জিনিষগুলো নোট করে দিলেন, টেলিফোনটা রিসিভ করলেন—সবই লাইট ওয়ার্ক। তাছাড়া······

তাছাড়া কি? কল্পনা উৎসুক হয়ে উঠল।

তাছাড়া আপনার রিয়েল ওয়ার্ক হচ্ছে আমাদের একটু কম্প্যানি দেওয়া। দেখুন, উনি বিলাত ঘুরে এসেছেন, অনেক মেয়ের সঙ্গে মিশেছেন, অনেক টাকার মালিক কিন্তু আপনজন বলতে কেউ নেই— Feeling loneliness সেইজন্য উনি এমন একটি আপ্-টু-ডেট্ গার্ল চান যে ওঁকে আনন্দে রাখতে পারবে। কাজ আপনার কি—কিছুই না—only to give us company of yours.

আমরা বন্ধু হ'তে চাই।

কল্পনা হাসবে না কাঁদবে? নিজেকে সামলিয়ে নেবার অভ্যাস ওর অনেক ঠেকে শেখা। কম্প্যানি বলতে কি আশা করেন? এ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নেই বরং আপনিই এক্সপ্লেন করুন না, সেইটাই ভাল হবে।

ওর কথায় ওরা দুজনেই খুব সম্ভব উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো। দেখুন এ বিষয়ে ঠিক একটা ডেফিনেশন দেওয়া মুস্কিল, তবে আপনার ডিউটি হবে আমাদের সঙ্গে গল্প করা, খাওয়া, বেড়ান, সিনেমায় যাওয়া—এই আমরা টুরে যাচ্ছি বম্বে—আপনিও সঙ্গে যাবেন। চলুন না আজই মেট্রোতে 'গন উইথ দি উইণ্ড' দেখতে—চমৎকার হয়েছে বইটা।

শুনেছি, কিন্তু আমার আজ অন্য এনগেজমেণ্ট আছে, মুস্কিল— সমান ভাবে চাল দিল সেও—আচ্ছা আর একদিন যাওয়া যাবে—কি বলেন?

বেশ, আজ তাহলে আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি—কোন্ দিকে যাবেন?

রাস্তার নাম বলতেই হু হু করে ছুটে চলতে লাগল গাড়ী। নরম গদীর ওপরে হেলান দিয়ে বসল কল্পনা, বিদেশী শাসকের অর্থে এরা চালাচ্ছে মোটর—অজস্র খরচ করতে চায় লেডি কম্প্যানিয়ন

রাখতে। সি ইজ চার্মিং—হাসি পেল ওর। কমপ্যানিয়নসিপের জন্ম ও চার্মিংই বটে কিন্তু আজ যদি চাইত গৃহস্ত্রীর সম্মান—তাহলে? ভীরু তাড়া খাওয়া মেষশাবকের মত ছুটে পালাত নিশ্চয়ই।

আর নীলাম্বর? ঘৃণায় ওর সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠলো। বাংলা দেশের তুলাল, ওর দেশভাই—সেই কিনা তার ঘরের মেয়েদের সম্মান পণ্য করে ধরেছে ভিন্ন সমাজের বন্ধুত্ব কুড়াতে আর পরের পয়সায় নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে। চমৎকার……

কি বলবে এদের? কি বলবার আছে তার?

বাড়ীর কাছে পৌছে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল কল্পনা—এ নমস্কার কি মনুষ্যত্বের সম্মান, না অপমানিতা মানবীর কঠিন বিদ্রূপ?

অবশ্য চাকরী ওর হ'লই। যুদ্ধের বাজার—নিত্য নূতন আফিস হ'চ্ছে খোলা, লোকের চাহিদাও বাড়ছে প্রতিদিন। সারা বাংলার লোক এসে ক'লকাতায় ভীড় জমিয়ে তুলেছে। তাদের কারুর আছে আত্মীয়তা, কারুর আছে ব্যক্তিগত জানাশোনা, কারুর আছে সুন্দর চেহারা—কারো বা বিলিতি ডিগ্রীর ছাপ, ট্রেনিংএর জোর।

বাংলা দেশের বেকার ছেলেমেয়ের সংখ্যা এত বেশী ওর জানা ছিল না। নিত্য নূতন সমস্যার সমাধান করতে যেয়ে কল্পনা হাঁফিয়ে উঠেছিল, এমন সময় পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের বিজ্ঞাপন দেখে করে ফেল্ল-য়্যাপ্লিকেশন—সঙ্গে সঙ্গে এক ইণ্টারভিউ।

অবস্থা তখন একেবারে চরমে দাঁড়িয়েছে—সস্তার বাজারে পাঁচসিকে দিয়ে কেনা স্যাণ্ডেল আর রিপু করা কাপড়-জামাই বেচারীর শেষ সম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে—একেই কুশ্রী চেহারা তাও হয়ে উঠেছে শীর্ণতম।

চেহারার জন্য আগে ওর ভাবনা হ'ত না। বিয়ের বাজারে আনাজ-পত্রের মত বিকো'তে যাচ্ছে না তো! কিন্তু এখন বুঝেছে চেহারার দাম চাকরীর বাজারে আরও বেশী—সুন্দর স্মার্ট চেহারার মেয়েরা, যাদের শ্রী আছে, সম্পদের লাস্য আছে তারাই তুড়ি মেরে যাচ্ছে এগিয়ে—আর সমস্ত দেহে অভাবের রিক্ততার চিহ্ন এঁকে দিনদিন ওরা পড়ছে পিছিয়ে। এও কপালের লেখা—সংসার খেলার ছক্কাপাঞ্জায় ওর হাতে উঠেছে শূন্য।

যাই হোক্‌ ইণ্টারভিউ পেয়ে সে আর দেরী করল না, নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই রওনা দিল। আজকাল ট্রাফিকের যা অবস্থা হয়ত মাঝপথেই আটকে থাকবে ঘণ্টা দুই।

* * * পুষ্পিতার সঙ্গে অনেকদিনের ছাড়াছাড়ি, প্রথম দর্শনেই সে পুলকিত হয়ে এগিয়ে এল, এমন সময় এখানে ওর কথা কে ভেবেছিল ?

পুষ্প—

পুষ্পিতাও খুসী হোল—একি রে ? তোর এমন চেহারা হ'ল কি করে ? অসুখ করেছিল নাকি ?

অসুখ হচ্ছে অভাব, পঞ্চাশের মন্বন্তরের ব্যাকগ্রাউণ্ডে। তোর কি খবর পুষ্প ? মিঃ চ্যাটার্জ্জি ?

অনেক কথা অনেক ব্যাপার ঘটেছে এর মধ্যে। পুষ্পিতা এগিয়ে চল্ল—আমার সঙ্গে আয়, ইণ্টারভিউ দিতে এসেছিস্ ?

হ্যাঁ, কিন্তু তুই ?

দু'জনে মিলে একটা ঘরে ঢুকল—আরও অনেকগুলি মেয়ে বসে আছে সেখানে, বোধ হয় সবাই ইণ্টারভিউ দিতে এসেছে ওরই মত। খুব পরিচিতের মত পুষ্প ওদের ছাড়িয়ে একটা পার্টিশান দেওয়া ঘরে ঢুকল।

বোস্ এখানে—অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে। পুষ্পিতার অনেক পরিবর্ত্তন এসেছে চাল-চলনে। আগের চাইতে মোটা হয়েছে, ফর্সাও; পরনে দামী জর্জ্জেটের শাড়ী—হাতে গলায় অনেক দামী দামী গহনা।

এ সব কিরে পুষ্প ? তুই এমন ভাবে চলে ফিরে বেড়াচ্ছিস্ যেন এটা তোর নিজের ঘরবাড়ী—এসবের মানে কি ? কোথায় টেনে আনলি আমাকে—ইণ্টারভিউ আছ যে !

তা কি হয়েছে ? পুষ্পিতা মুখের একটা ভঙ্গী করল—চাকরী তোর হবেই, ভয় নেই। আমি তো প্রায়ই আসি এখানে অনেকের সঙ্গে

জানাশোনা আছে আমার। মিঃ চ্যাটার্জির জন্ত অর্ডার যোগাড় করতে আসতে হয় আমাকে।

অর্ডার যোগাড় করতে? কল্পনা প্রতিধ্বনি করল, তুই কি চ্যাটার্জির পার্টনার হয়ে পড়লি; আমার তো ধারণা ছিল·········

মুখের কথা কেড়ে নিল পুষ্পিতা—লাইফ পার্টনার, না? লাইফ পার্টনার অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রী আর সেইজন্তেই তো গতি হোল এখানে—মাথা নাড়া দিল ও; সঙ্গে সঙ্গে সরু সিন্দুরের রেখা ওর সীমন্তে বিদ্যুতের দীপ্তির মত চক্‌চক্ করে উঠল—আর এই জন্তেই তো বিয়ে করেছেন আমাকে।

এমন সময়ে আর একজন ঢুকলেন সেই ঘরে, দীর্ঘদেহ, মিলিটারী ড্রেস পরা একজন ভদ্রলোক। লাফিয়ে উঠলো পুষ্পিতা—মিঃ স্যানিয়েল—Here is my another friend, you have to provide her, poor girl! শেষের কথায় ও একটু টান দিল।

নাথিং সিরিয়াস—ভদ্রলোক ওর নগ্ন বাহুখানি যেন আলিঙ্গন করে ধরলেন—নটি গার্ল এতক্ষণ কোথায় ছিলে? Just after you.

খিল খিল করে হেসে উঠল পুষ্পিতা—Here with old friend.

কল্পনা, ইনি মিঃ স্যানিয়েল, বড় অফিসার—তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন।

নমস্কার—কল্পনা ওর কাণ্ডখারখানা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

Good morning—চলুন, আপনাকে য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দিচ্ছি। পুষ্প, you charming flower don't fly. আমার দরকার আছে।

অলরাইট—আমিও তো তোমারি কাছে এসেছি, বিলিতি কায়দায় পুষ্পিতা মাথা ঝাঁকাল।

চাকরীটা পুষ্পিতার কল্যাণেই হ'ল তবু তার ওপর খুসী হতে পারল না কল্পনা। এখন যেন তার আগেকার সেই পরিচিতা পুষ্পিতা নয়—বরং তাদেরই একজন ঠোঁটে গালে, হাতের নখে রঙ মেখে, বুককাটা ব্লাউজের উপর জর্জ্জেট শাড়ীর আঁচল টেনে যারা ঘুরে বেড়ায় ট্রামে বাসে আরও অনেক জায়গাতে তাদেরই সগোত্রীয়ার মূর্ত্তি হয়েছে ওর—কেন? কেন?

ছোট্ট একটা সন্দেহ কাঁটার মত বিঁধছিল ওকে। মিঃ চাটার্জ্জি কি ওকে গ্রহণ করেছেন ওর ভোল বদলে দেবার জন্য? সহধর্ম্মিণীর সম্মান বদলে নূতন সংস্করণ করেছেন ওকে অর্ডার সাপ্লাই করবার জন্য? স্বামী হয়ে স্ত্রীর লাবণ্যময় আকর্ষণে গাঁথছেন ধনসঞ্চয়ের তীর? হতেও পারে, এদেশে সবই সম্ভব। সতীত্বের, সম্মানের বড়াই যতখানি ঠিক ততখানিই অধঃপতন হয়েছে অন্তরের, অভাব আর দুঃখের পরিবর্ত্তে ওরা সহজ ভাবে চলতে চায় স্বচ্ছলতার মধ্য দিয়ে, আর সেইজন্ত যে কোন উপায় অবলম্বন করতে দ্বিধা নেই ওদের।

অনেক কথা জানবার ছিল ওর, কেমন করে সেই সলজ্জা ভীরু মেয়েটির পরিবর্ত্তন হোল প্রগলভা নাগরিকার বেশে? জানতে ইচ্ছা হচ্ছিল ওর আত্মসম্মান কি বলে? কিন্তু পুষ্পিতা বোধ হয় ওর মনের কথা বুঝেই সে স্থযোগ দিল না। ট্রাম লাইন পর্য্যন্ত ওকে পৌছে দিয়েই স্থানিয়াল বলে সেই পরিচিত ভদ্রলোকটির সঙ্গে কোথায় সট্‌কে পড়ল।

একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে-ই বা কি করবে? সোজা ট্রামে উঠে বসল। ট্রামটাতে কি অসম্ভব ভীড়, বাদুড় ঝোলার মত করে ঝুলছে লোকগুলো। লেডিস্ মার্কা দু'খানা সিট আছে বটে। কিন্তু তা কটা মেমসাহেবে ভর্ত্তি হয়ে গেছে আগেই। স্বজাতীয়া হ'লে

হয়ত ওরই মধ্যে একটু স্থান দান করতে পারত কিন্তু নেহাৎই বাঙ্গালীর মেয়ে দেখে আর সে সুযোগ দিল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত ধাক্কা খেতে খেতে চল্ল সে।

এত ভীড়ে আপনারা কেন যে ট্রামে চড়েন, সহানুভূতি দেখিয়ে একটি লোক মন্তব্য প্রকাশ করল—কেউ একটু জায়গা দিল না!

আপনিই দিন না দাদা, একজন টাই ঝোলান ছোকরা মুখের ধোঁওয়া ছাড়ল,—ওঁরাই বা ওঠেন কেন সমান তালে? যানও তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? আমরা কি করব?

আর জায়গা ছাড়লেই বা চলে কি করে? আর একজন সায় দিল। দুজনের জায়গা জুড়ে বসবেন ওঁরা সব, লোকের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করতে পারেন সমানে কিন্তু সিটে বসতে মান যায় আবার—ছেলেদের পাশে বসতে পারবেন না।

বেশী বয়সের একজন ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে এদের বাগ্‌বিতণ্ডা শুনছিলেন—এতক্ষণে নিজের সিট থেকে ডাক দিলেন—এদিকে এসো তো মা, আর কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে যাবে? আমার জায়গাতে বসো।

বসতে পেয়ে মনে মনে কৃতজ্ঞ হল কল্পনা, ও ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে, সত্যিই কষ্টকর মনে হচ্ছিল ওর। শুধু দাঁড়িয়ে থাকাটাই তো নয়, যারা উঠবে এবং যারা নামবে তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা মেশান স্পর্শসুখ উপভোগ করা ছাড়াও অন্যদের অনাবশ্যক উপদেশ ও সহানুভূতি। কিন্তু বুড়ো মানুষটি দাঁড়িয়ে যাবেন সেই বা কেমন? লজ্জিত ভাবে কল্পনা বল্লে—কিন্তু আপনি?

আমি এই এখানেই নেমে যাব মা—শান্তকণ্ঠে তিনি বললেন, তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।

বাস্তবিক পরের ষ্টপে তিনি নেমে গেলেন এবং পাশের লোকটিও নেমে যেতে কল্পনা হাঁফ ছেড়ে সহজ হয়ে উঠল।

অনেক ঘেমে, অনেক ক্লেশে বাড়ী এসে পৌছল যখন তখন শীতের ছোট বেলা প্রায় সন্ধ্যায় মিলিয়ে এসেছে। ক'টা ঘণ্টার জন্যেই বা বাইরে ঘুরে এল কিন্তু অভিজ্ঞতার খাতায় লিখে রাখবার মত সঞ্চয় হোল প্রচুর। যদি সম্ভব হয়—পঞ্চাশের ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে আঁকা পরিবর্ত্তিত, অপমানিতা নারীমূর্ত্তির ছবি সে এঁকে তুলবে তুলির টানে।

জানালার বাইরে লক্ষ্য করল কল্পনা, আঁকড়ে ধরে থাকবার গভীর ইচ্ছা নিয়ে মিলিয়ে চলেছে দিনের আলো। গভীর বেদনায় নেমে আসছে রাত্রির অন্ধকার, ব্ল্যাক আউটের অন্ধকারে লুকিয়ে।

এই যে মুহূর্ত্ত বিদায়-লগ্নের—এই তো তার সত্যকার রূপ, অপমানিতা নারীর বেদনাময়ী মূর্ত্তি। কিছু অভাবে কিছু অদৃষ্টের লাঞ্ছনায় ওর জীবনে ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার, তাকেই ঘনায়িত করে তুলছে মানুষের হাতে গড়া অবমাননার ইতিহাস। তার মধ্য দিয়েই সংগ্রাম করে যেতে হবে ওকে—জীবনের, যৌবনের, আনন্দের, গৌরবের * * * নূতন সূর্য্যের মত উদয়ে রাত্রির মত লাঞ্ছনায় ভরা দুঃখের ভিতর থেকে তারই মত মহান্ সম্ভাবনার ভাস্বর জ্যোতিতে! আজকের অভিজ্ঞতা, পেছনে ফেলে আসা ইতিহাস তাকে মহিমময়ী করে তুলুক, ওর সাধনা হোক্ সত্যের, সৌন্দর্য্যের, স্বপ্নের!

অভাবের শেষ সীমায় না পৌঁছলে কি করত বলা যায় না কিন্তু এখন আর উপায় নেই, মনের গ্লানি মনে চেপে রেখেই কল্পনাকে নিতে হ'ল চাকরীটা। যুদ্ধের বাজারে মাস গেলে নির্দ্দিষ্ট টাকার দাম ওর কাছে কম নয়।

খেতে হবে, পরতে হবে, শুধু তাই নয়, দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হচ্ছে প্রতিদিন তারই পাথেয় দিয়ে পরাধীন দেশের সাহসিকা নারীর সংগ্রাম—ভালভাবে বেঁচে থাকবার—কারো কাছে মাথা নত করে নয়, ভিক্ষা চেয়ে নয়, শুধু নিজের যোগ্যতায়—তাকেও সমানভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, ওকে ভবিষ্যৎ পথিকদলের সামনে আদর্শ করে রাখবার জন্য।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রকাশ কি ভাবল তা কে জানে, কল্পনার এ চাকরী নেওয়াটা তার কাছে মোটেই প্রীতিকর বলে মনে হ'ল না, অথচ না নিয়েই বা কি করবে? তার একার আয়ে চলে না এমন নয় কিন্তু বৃহৎ পরিবারের দুঃখ মোচনের ভার তার উপরে, সেখানে আর একজনের ভার নেবার মত আর্থিক যোগ্যতা তার নেই। চলে হয়ত যায়, কিন্তু কোনমতে দিন কাটানই তো সব চেয়ে বড় কথা নয়—তাছাড়া নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার যোগ্যতার সঙ্গে বৃহৎ পৃথিবীর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করাটাও দরকার। বাইরের জগতের লাঞ্ছনা, বঞ্চনা আর স্বার্থের আঘাতে নিজের মনের স্বরূপ ফুটবে আরও বেশী। তাই ওর হোক্।

প্রকাশ, তুমি কি বল? চাকরীটা কি নেব? মুখ দেখে তো খুব খুসী মনে হচ্ছে না তোমাকে।

কল্পনা প্রকাশের গম্ভীর মুখের দিকে ইঙ্গিত করল।

খুসী হবার মত এর মধ্যে কিছু আছে নাকি ?

নেই ?

কি থাকতে পারে ? আমাদের অযোগ্যতাই তোমাদের বাইরে এনে দাঁড় করায়, পুরুষের এত বড় লজ্জার চিহ্ন ঢাকব কি দিয়ে ? খুসী হবার কথা তো এটা নয়।

আমাদের সাহায্য তা হলে তোমরা চাও না।

চাইব না কেন ? কিন্তু কাজের ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে তো ? হাত আর পা, দুটোর ফাংসন যদি একই হোত তাহলে মানুষকে একটু অসুবিধায় পড়তে হোত না কি ?

তাহলে—

তাহলে আর কি ? আজ জয়েন করে ফেল, বাইরের জগৎকে চিনবার এতবড় সুযোগ আর পাবে না যখন তখন আর দ্বিধা করবার দরকার নেই। ফেরার পথ তো তোমার খোলাই থাকল—যখনি ইচ্ছা কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এসো।

অকারণে ?

হ্যাঁ অকারণেই, সকারণে ছাড়বার দরকার যেন তোমার না হয়। আমি চাই, তোমার আত্মসম্মানে যেন কোন কারণেই ঘা না লাগতে পারে।

চাকরী না নেবার প্রশ্নই যখন উঠতে পারে না তখন আর কি ? চাকরী সে নিল, তারও সঙ্গে ডায়েরী লেখার অভ্যাস করে নিল। যদি কোনদিন ওর হাতে এসে পৌছায় কাউকে পথ চিনিয়ে দেবার ভার তাহলে আজকের কষ্ট করে শেখা অভিজ্ঞতাগুলোও তাকে সাহায্য করতে পারবে এই আশায়।

আফিসে চাকরী এদেশে মেয়েদের এই প্রথম। প্রকাশ কোন কথা বলে ওর সংশয়কে বাড়িয়ে তোলেনি; তবু কল্পনা প্রথমটা ভাবল—সমাজ সংসারের বিরূপতা সহ্য করে পথ করে দিতে হবে ওকে তারই মত অনেক দরিদ্রঘরের মেয়েদের জন্য; কেবলমাত্র দুটো ভাতের অভাবে আত্মীয় স্বজনদের কাছে যাদের লাঞ্ছনার সীমা নেই; কিন্তু তবু উপায় করার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ যারা প্রচলিত প্রথার বাইরে পা বাড়াতে সাহস করে না তাদের জন্য। কদিন এভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব? স্বাধীন দেশের মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ থাকে, প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তুলবার ক্ষেত্র থাকে কিন্তু এখানে তা নেই এবং নেই বলেই তো দরকার তার মত মেয়ের—যারা নিরন্নের দাবী নিয়ে ক্ষুধিতের দাবী নিয়ে, সবল, সুস্থ, সুন্দর জীবনের দাবী নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে।

* * * কিন্তু প্রথম ধাক্কা লাগল চারপাশের গড়ে তোলা আবহাওয়া থেকে, বিরাট একটা আফিস……সারি সারি বসেছে দরিদ্র প্রার্থীর দল, চোখে তাদের ক্ষুধাতুর হিংস্র লোলুপ দৃষ্টি, মুখের উপর শতশতাব্দীর অনভিজ্ঞতার ছাপ আঁকা। আফিংএর নেশার মত অন্ধ আবেগে ছুটে চলেছে রসাতলের পথের দিকে—বছরের পর বছর কেরানীগিরির ছোট্ট পরিধির মধ্যে কাটিয়ে ভাল ভাল হৃদয়বৃত্তিগুলি গিয়েছে শুকিয়ে। এরা কারা?

এরা কোন্ দেশের মানুষ? চাঁপার মত রঙের সূর্য্যের আলোর দেশের মানুষ; দাসত্বের লজ্জা—এদের তাও গিয়েছে মিলিয়ে, ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার! তাই দিনের বেলা সারি সারি ইলেকট্রিকের আলো জ্বলছে, ম্লান হলদে আলোর আভা ছড়িয়ে পড়েছে সারা অফিসটাতে—ওদের রুগ্ন দেহমনের প্রতিচ্ছবি যেন।

অল্পদিনেই ওদের দলে মিলিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হল কল্পনাকে, কিছুটা ওর নিজের, কিছুটা ওর সহকর্ম্মীদের গরজে। ওর সবল প্রাণের স্ফুলিঙ্গটুকু নিভিয়ে দেবার জন্য ভীড় করে এল অনুরাগ, বিরাগ, লোক-কুৎসা—আরও কত কি।

একটি একটি করে প্রত্যেকটা দিনের ইতিহাস ওর স্মৃতির পাতায় ফুটে রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে, সে কি ভুলে যাবার ?

প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে। বিরাট জনতার উৎসুক চোখের সামনে বেশ সঙ্কুচিত হয়ে বসেছিল কল্পনা, মনে মনে বেশ হাঁফিয়ে উঠেছে সে।

আপনি আজ এলেন ? লম্বা ধরণের একটি ছেলে প্রশ্ন করল, কোন সেকসান জানেন ?

আস্তে করে উত্তর দিল সে—তা জানিনা তো।

জয়েনিং রিপোর্ট দিয়েছেন কোথাও ?

না—

তাহলে আসুন আমার সঙ্গে, আপনাকে কোথাও বসিয়ে দিই, নইলে আজকের মাইনে পাবেন না।

রিপোর্ট টিপোর্ট লিখে দিয়ে একখানা চেয়ার যোগাড় করে নিজের পাশেই বসিয়ে নিলেন তিনি। বসুন, আপনি আমাদের সঙ্গেই কাজ করবেন, আমাদের একজন নূতন য়্যাসিস্ট্যাণ্টএর দরকার আছে।

অমল—আর একজন উৎসুক হয়ে উঠল, ইনি কি তোমাদের এখানেই এলেন ? কবে এলেন, আজ ?

সবে আজকে জয়েন করেছেন—ভবানীদা চলুন বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি।

চল—একেবারে চা-টাও খেয়ে আসা যাবে। ভবানীদাও উঠে পড়লেন।

কি হে কেমন বুঝছ? লেডি য়্যাসিস্ট্যান্টটি কি তোমার? একেবারে ফ্রেশ আনকোরা নিয়ে তোমার কি হবে হে? ভবানীদা প্রশ্ন করলেন।

আপনিও যেমন, দু'চারটে ছোপ লাগান না হলে আপনার ভাল লাগে না। আমার তো বেশ লাগছে—ফ্রেস ফ্রম হোম; জমাতে পারলে বেশ কিছুদিন আরামে কাটান যাবে। যারা নতুন বাইরে এসেছে, তাদের নিয়েই তো সুবিধা—ইচ্ছামত চালান যায়। পুরানো হলেই এক্সপিরিয়েন্সড্ হয়ে পড়ে কিনা—তখন আর আমাদের বিশ্বাস করে না তা জানেন?

তাও বটে কিন্তু আমার দিন তো মন্দ কাটছে না, আমার উনিরাও তো বছর ঘুরে গেল, অন্যদিকে দৃষ্টি দিলেন না।

এই জন্তেই তো হিংসে হয় দাদা, আমরা রইলুম উপোস্ করে আর আপনি ডাইনে বাঁয়ে চিনির নৈবিদ্যি নিয়ে বসে গেছেন—একটু ভাগ-টাগও দিলেন না ছোট ভাইকে।

বারণ করিনি তো ভাই—এঁরা যখন পাব্লিকে এসেছেন তখন পাবলিকের প্রপার্টি নিশ্চয়ই। তোমাদেরও তো একটা রাইট আছে।

সেটা বোঝে কে? ওঁদের যে সতীলক্ষ্মীর মত আপনাতেই ভক্তি, ভুলেও কারও সঙ্গে কথা বলতে চান না, তার কি উপায় হবে?

ট্রান্সফারড্ হয়ে এসো, পাশেই সিট করে দিচ্ছি সারাদিন ধরেই ট্রাই দিও, আপত্তি করি তো বলো। কিন্তু নবতমাকে ছেড়ে আসতে পারবে?

আসব নিশ্চয়ই, কিন্তু মাস দুই পরে। কি বলেন? দুজনেই হেসে উঠলো।

কিন্তু বুঝতে ওদের রীতিমত ভুল হয়েছে দেখা গেল। অন্তরঙ্গ হওয়া দূরে থাক্, নূতন মেয়েটা কথাই বলে না নেহাৎ দরকারী দু'একটি ছাড়া। এক তরফা প্রশ্ন করে অমল তবু কিছুদিন চেষ্টা করেছিল কিন্তু কল্পনা উত্তরই দিত শুধু, প্রতিপ্রশ্ন করত না। হতাশ হয়ে অমল ক্রমশঃ রেগে উঠলো। নিশ্চয়ই মেয়েটার মধ্যে কোন মিস্‌ট্রি আছে নইলে তার দিকে লক্ষ্য করে না এমন মেয়ে তো সে কোথাও দেখেনি। ভালমানুষীর মুখোসটা ওর খুলে দেবে তবে ওর নাম অমল ব্যানার্জ্জি।

ভবানী দাস, সকলের কমন দাদা, তিনিও ওকে খুব উৎসাহ দিলেন —এতকাল স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে আসছি আজ কোথা থেকে একটা পুঁচকে মেয়ে এসে সব ওলট-পালট করে যাবে একি কখনও সম্ভব হয়? তোমাদের পক্ষে ভীষণ রকম লজ্জার কথা এটা।

শুধু ছেলে মহলে নয়, মেয়েদের মধ্যেও কল্পনাকে নিয়ে বেশ একটা আলোচনা চলত। কল্পনার ঈষৎ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখ, ওর চালচলন, একটু দূরত্ব রেখে চলা, সকলের সঙ্গেই মাখামাখি না করা ওদের মধ্যেও বিরক্তির সঞ্চার করেছিল। কল্পনা না আসা পর্য্যন্ত ওদের শান্তি নষ্ট হয়নি, কাজ করে, গল্প করে, টিফিনরুমে বসে প্রত্যেক মেয়ের চরিত্রের খুঁৎ প্রচার করে, নিজের ভালটুকুর প্রচার করে বেশ কাটাচ্ছিল দিনগুলি। হঠাৎ যেন বাধা পড়ল। কারুর নিন্দা যে করে না বরং প্রতিবাদ তোলে তাকে নিয়ে বিব্রত হয়ে উঠতে দেরী হ'ল না, ফলে জনপ্রিয় হবার শেষ সম্ভাবনাটুকুও হারিয়ে কল্পনাই ওদের আলোচনার বস্তু হয়ে উঠল। আলোচনার ঢেউ সহকর্ম্মী আর কর্ম্মিণীদের মহল ছাড়িয়ে ওর কাছেও পৌঁছে যেতে দেরী হল না।

সেদিন প্রকাশের আসবার কথা ছিল; ইচ্ছা করে একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল কল্পনা। কলেজ ষ্ট্রীটটা একবার ঘুরে যেতে

হবে; প্রকাশ বলেছিল, কোথায় নাকি সেল দিচ্ছে জুতা আর ছাতির। বর্ষাকালটা এসে গেছে প্রায়—দুটোরই দরকার, স্যাণ্ডেলে আর কাজ চলবে না।

বাসষ্ট্যাণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল জীবন, ওকে দেখেই এগিয়ে এল, মিস্ রয়, কোথাও যাবেন বুঝি?

বিরক্ত হলেও সেটাকে প্রকাশ করা চলে না,—হ্যাঁ একটু কাজ আছে আমার। কেন বলুন তো?

না, এই শুনলাম কিনা। তা কি বই দেখতে যাচ্ছেন?

বই দেখতে? তার মানে? বিস্মিত ভাবে কল্পনা ওর দিকে তাকাল। ছেলেটা তত চালাক নয়, একটু জেরা করতেই জানা গেল ওকে পাঠান হচ্ছে কল্পনা কোথায় যায় দেখতে। অফিসময় সবাই জানে—অফিসরদের সঙ্গে মেট্রোতে যাবার কথা।

প্রতিবাদ করতেও অসম্মান বোধ হয়।

অধঃপতনের এত বড় প্রমাণ পেয়ে যারা উৎফুল্ল হয়ে উঠল তাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কমল বোস। বয়স বোধ হয় চল্লিশের কাছাকাছি, স্থূল দেহে জীবন-অপরাহ্নের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে—তার উপর সযত্নে প্রসাধনের প্রলেপ আঁকা। মাথাভরা টাক কানের দুপাশে পাত্‌লা কয়েকগাছা চুল যৌবনের নিশান ওড়াচ্ছে। এদের প্রতি ভদ্রলোকের যত্নের সীমা নেই। প্রায়ই ছেঁটে সমান করে পমেটম লাগিয়ে ব্রাস করে আসেন। দাড়িগোঁপ-কামান প্রকাণ্ড মুখের উপর ছোট্ট নাকটি যেমন বেমানান, তেমনি মানায় নি তার ফোলা ফোলা গালের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া হাসির তরঙ্গ।

তবু ভদ্রলোক হাসেন এবং সর্ব্বদাই মেয়েদের চরিত্রগত ত্রুটি বিশ্লেষণ করে দেখান—কারণ তিনি নিজে একজন সমাজ-সংস্কারক,

দুর্নীতির প্রশ্রয় মোটেই দিতে পারেন না। এদের বাদ দিয়ে নূতন করে হিন্দুসমাজটা গড়ে তোলাই বেচারীর একমাত্র লক্ষ্য বলা চলে। নেহাৎ বরাতের দোষেই এঁকে চাকরীতে ঢুকতে হয়েছে, তাও আবার কলমপেশার চাকরী। ভাগ্যের প্রবঞ্চনা বোধ হয় একেই বলে।

কল্পনার সুস্থ, সবল তনুদেহটির প্রতি এঁর যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল, কিন্তু গান শুনিয়ে, গল্প করে, বংশ গৌরবের নজির দেখিয়েও তাকে ভোলাতে না পেরে ভীষণ রকম রেগে আছেন। পুরোপুরি বীরত্ব-ব্যঞ্জন—হয় অনুরাগ না হলে বিরাগ; মাঝামাঝি কিছু নেই। অনুরাগ যখন গ্রহণ করেনি তখন বিরাগটাই তাকে নিতে হবে, এবং চাকরীর ভয় দেখিয়ে ওর মাথা হেঁট করাতেই হবে।

দীর্ঘ একুশ বছর কাটিয়ে এতদিনে হারাল কল্পনা তার চরিত্র, যাকে সে ইস্পাতের মত ঝকঝকে শাণিত বলেই জানত। প্রকাশের প্রেমও যেখানে এতটুকু কামনার চিহ্ন আঁকতে পারেনি।

কল্পনা এঁদের নিত্য আলোচনার জিনিস হয়ে উঠল।

মেট্রোতে যাবার খবর সেকসন ইনচার্জ পূর্ণেন্দু সরকার আর ব্যোমকেশ সেনগুপ্তের কানেও পৌঁছে দিয়ে গেল কমল নিজেই। একে মেয়েটির চাল চলন ব্যোমকেশবাবুর পছন্দসই নয়—তা আবার মেট্রো!

এক টিপ নস্য নিলেন তিনি—রীতিমত কেলেঙ্কারী মশাই, ওকে আর রাখা উচিত নয়। মেয়েদের পক্ষে তো বটেই ছেলে ছোকরাদের সামনেও একটা অসৎ দৃষ্টান্ত রাখা উচিত হবে না।

পূর্ণেন্দু ঘোষ ঢাকার লোক, কথায় একটু উপভাষার টান। কিন্তু ছাড়াইবেন কেমন কইরা? এট্টা দোষ দেখান্ তো চাই।

এর বাড়া আবার দোষ আছে নাকি? ব্যোমকেশের চোখ চশমার পরিধি ছাড়িয়ে কপালে এসে উপস্থিত, কারেক্ট বাৎলেছেন দেখছি। চরিত্র হল মেয়েদের সবচেয়ে বড় জিনিষ তাই যার নেই সে তো একটা পাব্‌লিক নুইসেন্স বললেও চলে। তাকে রাখার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি আছে নাকি?

সে যাই হোক্‌, প্রমাণ দেখাইতে হইবে তো একটা?

নিশ্চয়ই, আমি নিজে বলব, সব কথা, সেদিন নিজের চোখে দেখেছি ওনাকে মেট্রোয় ঢুকতে একজন গোরা সোলজারের সঙ্গে তা জানেন? সে কি কেলেঙ্কারী—বলিনা শুধু বলতে লজ্জা করে বলে, ওর তো আর সে বালাই নেই—আছে আমাদেরই।

নূতন খবর এটা, কমল ভারী খুসী, ওপর দিকে নজর মেয়েটার তাহলে। চুপচাপ থাকাটা একটা পোজ? কালা আদমীর দিকে খেয়ালই নেই যেন, দাঁড়াও এবার—

বিরাগ ছাড়াও অনুরাগের উৎপাতও সইতে হত তাকে, অফিসে আসতেই স্বপন চুপি চুপি বলে গেল—মিস্‌ রয় সাবধান।

কিসের সাবধান?

আপনার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে ডিস্‌চার্জ করবার জন্য। ব্যোমকেশ, পূর্ণেন্দু, মোটা কমল, শৈলেন চ্যাটার্জ্জি সবাই এর মধ্যে আছে।

শৈলেন বাবুও? কিন্তু ওদের গ্রাউণ্ডটা কি—তা জানেন?

গ্রাউণ্ড আবার কি হ'তে পারে, আপনার উপর রাগ হচ্ছে আপনি ওদের সঙ্গে মেশেন না, অথচ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। সেই রাগে রাগেই তো।

তাতো বুঝলাম, কিন্তু কিছু একটা বলতে হবেই।

তাও বলেছে, আপনার ক্যারেকটার ভাল নয়, যেখানে সেখানে যান এই সব আর কি। আপনি একটু সামলে যাবেন।

ধন্যবাদ, কিন্তু সামলিয়ে চলবার আমার দরকার হবে না। চাকরীর মায়া আমার অত বেশী নয়।

নিষ্প্রভ হয়ে এল স্বপন—আপনি রাগ করছেন?

না, না, রাগ কিসের? আপনি তো ভালই করেছেন বলে।

স্বপন কল্পনার গম্ভীরভাব দেখে দুঃখিত হল। হাসিছাড়া ওকে মানায় না যেন। ওর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবার জন্য ও কি না করতে পারে? কিন্তু সে অধিকার কল্পনা দেবে কি?

কল্পনা দেবি—

চমকে উঠল কল্পনা, কি বলছেন?

যদি অফেন্স না নেন তো বলি।

হাসবার চেষ্টা করতে করতে কল্পনা উত্তর দিল—যদি মনে করবার মত না বলেন তা হলে অফেন্স নেব কেন?—

বলেই ফেলি তাহলে?—একমূহূর্ত্ত দম নিল সে; আপনাকে দেখে অবধি আমার মনে হয়—

কি মনে হয়?

আপনাকে যদি ঘরে নিয়ে যেতে পারতুম। রাগে, দুঃখে কল্পনার মুখ কালো হয়ে উঠল—ঘরে নিয়ে যাবার সৌভাগ্য আপনার হবে না, মিথ্যে মনে কষ্ট পুষে রেখে লাভ নেই জানবেন।

অল্পদিনেই হাঁপিয়ে উঠল কল্পনা, এমন করে কি চাকরী করা যায়? কাজ অবশ্য তেমন নেই, গভর্ণমেণ্ট অফিসে ষ্টাফ খুব বেশীই থাকে। তাছাড়া মেয়েদের উপর কাজের চাপ বড় একটা দেওয়াও হয় না, কাজের বদলে পাশে বসে গল্প করলেই সবাই খুসী। যারা বুদ্ধিমান এবং উপায় নেই তারা এভাবেই যতটা সম্ভব কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে, নিয়মিত মাইনে, ছুটি, এবং প্রমোশনের বন্যা তাদের উপর দিয়েই বয়ে যায়। আর যে হু'চারজন নিজের আত্মসম্মানটাকেই বড় বলে জানে আর সেইটাকেই বাঁচিয়ে রাখতে চায় প্রতিদিন; তাদের জন্য চারিদিকের থেকে ভিড় করে আসে অনুরাগ, বীতরাগ, শত্রুতা, কুৎসা এইসব। যাদের দেহে ও মনে কলঙ্কের ঘন কালী ঢালা, শুভ্র যেন কিছু তারা কিছুতেই দেখতে পারে না, চায় আঘাতের পর আঘাতে তাকে দলে মিশিয়ে নিতে।

চাকরী জীবনের প্রথম দিকে ছিল কাজের ছুতা করে হু'চারটে কথা বলে যাওয়া, অনাবশ্যক সুবিধা করে দেওয়া আরও কত কি। কিন্তু সেটাকে যখন ও আমলেই আনল না তখন সুরু হল ওর বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেওয়া, চরিত্রগত কুৎসা রটনা, অশ্লীল চিঠি ড্রয়ারে গুঁজে রাখা এই সব। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সীদের মনে এই সব ছাড়াও প্রবল হয়ে উঠেছিল কম্‌পিটিসনএর স্পিরিট। কেন ওরা চাকরী করতে এল ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে? এসেছে যখন, তখন সমান লাঞ্ছনা, শত্রুতা ওদের ভোগ করতেই হবে। উপায়হীন বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে, পাঁচজন স্বজাতি, স্বদেশবাসীর কাছ থেকে আর কি পেতে পারে?

কিন্তু এ দোষটা কি পুরোপুরি ওদের দেওয়া চলে? অনেকদিন ভেবেছে কল্পনা, বছরের পর বছর অল্প শিক্ষার ভার, কুসংস্কারের ভার, দাসত্বের ভার, গোলামীর ভার সহ্য করে যাদের সোজা হয়ে দাঁড়াবার, সবল পথে চলবার শক্তি গিয়েছে হারিয়ে, তাদের কাছে এর বেশী কি আর প্রত্যাশা করা যেতে পারে?

ভিতরে ভিতরে এখান থেকে চলে যাবার একটা আগ্রহ ছিল বলেই কর্মখালির পাতা দেখে য়্যাপ্লিকেশ'ন করা ওর একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এমন সময় একদিন অপারেটিং ডিপার্টমেণ্ট থেকে ইণ্টারভিউ এর চিঠি আসতেই সে ভীষণ খুসী হয়ে উঠল।

চাকরীটা যদি লাগে,, প্রকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে কল্পনা বল্লে—এই স্ত্রাষ্টি চাকরীটা দেব ছেড়ে। নেহাৎ অভাব না হলে কি আর এভাবে কাজ করি? প্রত্যেক মুহূর্ত্তে নিজের আত্মসম্মানে লাগছে আঘাত। তাছাড়া আমার সহকর্মীর দল যে ভাবে পেছনে লাগছে তাতে আমি না ছাড়লে ওরাই দেবে ছাড়িয়ে, তার থেকে সময় থাকতে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ কি বল?

প্রকাশ নিশ্চিন্তমনে বিছানার উপর গড়াগড়ি দিচ্ছিল সোজা হয়ে বসল,—সে তো বটেই। কিন্তু এখানেই কি আর তোমার চাকরী হবে ভাবছ? তোমার তো কোন ব্যাকিং নেই।

না-ই বা থাকল, কোয়ালিফিকেসান তো আছে, ম্যাট্রিক ষ্ট্যাণ্ডার্ড যাচ্ছি গ্রাজুয়েট-এর আবার ব্যাকিং কি?

দেখবে হয়ত অনেক এম. এ. যেয়েই হাজির হয়েছে।

দেখা গেল এবারও কল্পনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। বিনা ব্যাকিংএ পরীক্ষাগুলো পাশ করে একেবারে জয়েন করে ফেল্ল। কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে নূতন; চাকরীটার ভাল মন্দ দেখা দরকার, কল্পনাও তাই

করল। কাজের চাপ এখানে বেশী, চব্বিশঘণ্টার মধ্যে আটঘণ্টার ডিউটী দিতে হবে। প্রথম প্রথম বসে থাকতে খুবই কষ্ট হত, ক্রমশঃ অভ্যাস হয়ে গেল।

সহকর্মীর বালাই নেই বলেই দলে মিশে যেতে একটুও দেরী হল না। তার মধ্যে লুসির সঙ্গে ভাবটা জমেছে বেশী। ওদের সমাজে সৌন্দর্য্যের দাম খুব বেশী হলেও—ওরা জীবনের উপাসক। নেচে গেয়ে ফূর্ত্তি করে যৌবনের দিনগুলো ভোগ করে ওড়ায়, প্রাণের স্ফুলিঙ্গ তাই ওদের আকৃষ্ট করে আরও। তাছাড়া লুসির জীবনের ইতিহাস অনেকটা ওরই মত। আত্মীয় স্বজন কেউ নেই, মানুষ হয়েছে একটা কনভেণ্টে, ফলে অল্প বয়সেই বেরিয়ে পড়তে হয়েছে জীবনযুদ্ধে। ছন্নছাড়া জীবনের মতই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি ওর, কাজ করতে করতে গেয়ে ওঠে গানের এক কলি, কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়ে করে গল্প—অকারণে দেয় ভুল কানেকসান, হাসে খিল খিল করে।

নাইট ডিউটি, কাজ সেরে কল্পনা শুতে এল। ঘুমে চোখ ঢুলে পড়েছে। অনেক রাতে হঠাৎ লাইট জ্বলতেই ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল, ঘরে এসে ঢুকছে লুসি।

একি লুসি? কোথায় গিয়েছিলে?

বলব না ওর দুষ্টামী ভরা চোখে একটু বিষাদের ছায়া পড়েছে—দু'সপ্তাহ কাজ করেই সব জেনে নিতে চাও কল্পানা, বিশেষ এটা যখন তোমাকে জানতে হবে একদিন তখন জ্ঞানবৃক্ষের ফল যত দেরী করে খাওয়া যায়—ততই কি ভাল নয়?

জানতে বেশী দেরী হলোনা। দিন দুই পরে সুপারিন্টেণ্ডের ঘরে ওর ডাক পড়ল—গদি আঁটা একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে কুমার সেন, এখানকার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা।

মিস্ রয়—

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল কল্পনা—আমাকে ডেকেছেন ?

হ্যাঁ রিপোর্ট পেলাম আপনি নাকি ভাল করে কাজ করেন না ; ইনচার্জ্জ আপনার উপর অসন্তুষ্ট।

হতে পারে ; উত্তর না দিয়ে কল্পনা নত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। শেড দেওয়া হলদে আভা আলো ওর মুখে এসে পড়েছে, সমস্ত ঘরটা আলোতে ছায়াতে ভরা—ব্লাক আউটের ব্যবস্থা এটা।

অবশ্য আমি ব্যবস্থা করতে পারি, আস্তে আস্তে বিরাট অজগরের মত কাছে এগিয়ে এল সে, অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে কঠিন হাতে আঘাত করল কল্পনা। নাঃ, স্কুলের দিনের লাঠির ওস্তাদ কল্পনা আজও মরে যায়নি। এটুকু শিক্ষা বোধহয় পশুটার কাজে লাগবে।

অনেকদিন পরে পুরানো অফিসে ফিরে এল সে। সহকর্ম্মীর দল হৈ চৈ করে উঠল। পনের দিনের বেশী হয়ে গেছে ছুটি নেওয়া, অনেকের ধারণা ছিল ও আঁর কাজ করবে না কিন্তু ফিরে আসার মানে কি ?

ফিস্ ফিস্ করে অনুযোগ জানিয়ে গেল স্বপন—ভারি অন্যায় এটা কল্পনা দেবি, আপনার কাছে আশা করিনি। আশা করতে কে বলেছিল ? ম্লানভাবে কল্পনা বল্লে—কেন বলুন তো ?

চলে গেলেন একটা খবরও দিলেন না, কত খোঁজ করেছি আপনার বাড়ীর তা জানেন ?

বাধিত হয়ে কল্পনা চুপ করে থাকল। এর মধ্যে অন্যদের আগমনে স্বপন সরে গেল—সব কথা বলা না হতেই। অসুখ করেছিল মিস্ রয় ? মোটা কমল ব্যথিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল —বড্ড রোগা হয়ে গেছেন যে।

অসুখটা কি ? ভবানীদাস বিশেষ ইঙ্গিত করল, সিরিয়াস্ কিছু ? অল্পদিনেই একেবারে সাদা হয়ে গেছেন যেন।

উদাস দৃষ্টিতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল সে। উপায় নেই, কাজ করতে হলে এগুলো নিঃশব্দে হজম করে যেতে হবে। কয়েকটা দিনের অনভ্যাস, এর মধ্যেই কত দূরে পিছিয়ে পড়েছে সে—আবার নূতন করে অভ্যাস করতে হবে এই সব কথাবার্ত্তা, কামার্ত্ত চোখের দৃষ্টি, বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি, আর আলোচনা। উঃ—ভাল ভাবে বেঁচে থাকার কি কোন উপায় নেই, পথ নেই * * *

* * * এসব কি সত্যি রাণু ? ডায়েরীর পাতা থেকে মুখ তুলে প্রকাশ কল্পনার চোখের দিকে তাকাল গভীর দৃষ্টিতে—না তোমার কল্পনাপ্রবণ মনের স্বপ্ন বলত ?

কল্পনা হাসল না অন্যদিনের মত, আস্তে আস্তে উত্তর দিল—কেন জিনিষটা কি খুব অতিরঞ্জিত বলে মনে হচ্ছে তোমার ? কিন্তু আমার উপলব্ধির মধ্যে এতটুকু মিথ্যে নেই প্রকাশ যা আমি দেখেছি, বুঝেছি, ভেবেছি, তারই অসম্পূর্ণ পরিচয় আছে ওর মধ্যে —বাকীটা আছে আমার মনে। যে লাঞ্ছনার অপমানের আগুণে জ্বলে যাচ্ছে আমার মন, কতটুকুই বা দেখতে পেরিছি ওর মধ্যে যদি পারতুম ভাল করে তাহলে আমার নবজন্ম হত, সেই সঙ্গে আরও অনেকের।

নবজন্মের দরকার তোমার আছে নাকি ? এ জন্মেই কি যথেষ্ট দেখা হয়নি ?

হয়েছে বলেই তো আরও দরকার নূতন হবার, নূতন প্রেরণা, নূতন সাহস নিয়ে শুরু হবে নূতন অভিযান—দলে দলে ছুটে আসবে নূতন দিনের মেয়েরা—বেছে নেবে তাদের কাজ। সাড়া

জাগিয়ে দেবে দিগ্‌বিদিকে—গড়ে তুলবে নূতন সমাজ, নূতন মানুষ। সেই গড়ার স্বপ্নই তো দেখি আমি; তাকে সার্থক করতেই দরকার আমার নূতন জন্মের।

তোমার এ জীবনটা কি সে কাজের পক্ষে যথেষ্ট নয়?

নয়ই তো। সারাদিন কাটে কাজে আর অন্নচিন্তার দুশ্চিন্তায় অন্য কিছু করব কখন বল? সতরঞ্চির মত ছক কাটা জীবনে কতটুকুই বা দেখতে পাচ্ছি বল? ঘানিতে বাঁধা কলুর বলদের মত অভাব অনটনে আমাদের চোখেও যে ঠুলি বাঁধা।

তা সত্বেও তুমি করতে পার অনেক কিছু। যা দেখেছ তাই প্রচার কর না সারা দেশে—একটা সাড়া পড়ে যাক্।

প্রচার করব কি করে? ওয়েলিংটন স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে চীৎকার করব?

না, অতদূরে যেতে হবে না, লিখলেই ঢের হবে। লিখে লিখে পাঠাও কাগজে। রচনা করে তোল দুঃস্থা মেয়েদের সত্যকার ইতিহাস—তাই হবে তোমার উপযুক্ত কাজ।

খিল খিল করে হেসে উঠল কল্পনা—কিন্তু আসল কথাই ভুলে যাচ্ছ, সত্যকার কাজে পয়সা নেই। আমার খাওয়া পরা চলবে কি করে? এটা বাংলা দেশ, এখানকার লোকে সাহিত্য বোঝে, ভালবাসে—না পড়েই, বিচার না করেই সমালোচনা করে কিন্তু লক্ষ্য নেই সাহিত্যিকদের দিকে। যেটুকু দরদ আছে তাও প্রাচীন লেখকদের জন্য—আমার লেখা ছাপাতে সম্পাদকের দলই টাকা চেয়ে বসবেন—তখন?

তা হোক্—তবু তুমি আঘাত কর সমস্ত শক্তি দিয়ে, জীর্ণ অচলায়তনের গোড়ায় যে প্রাচীনতার মোহে এ দেশের লোক ঘর বাঁধে, জীর্ণ বটের কোটরের মত ভেঙ্গে পড়া ঘরে, হাজার হাজার

বছর আগেকার সংস্কারের শেকলে বাঁধে মনের গতিকে, আঘাতে আঘাতে তাকেই কর পরাজিত, নূতন দিনের নিশান উড়ুক সেখানে, যুগের পরিবর্ত্তন হোক্। ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের কথা নাই বা ভাবলে!

তারপর—

তারপর বাঁধব ঘর। তুমি আর আমি, সংসার যুদ্ধে জয়ী নারী আর পুরুষে। আমাদের ঘর ভরে উঠুক শিশু কিশলয়ে—আগামী যুগের প্রতিনিধিতে। তাদের গড়ে তোল তুমি, আমাদের আজকের আরম্ভ করা জীবন সার্থকতায় ভরে তুলবে তারা, ওদের মধ্যেই টিঁকে থাকব আমরা, আমাদের প্রেম, আমাদের স্বপ্ন।

বলিষ্ঠ মন তার, বলিষ্ঠ ভাবেই স্বপ্ন দেখে প্রকাশ। সংসারে নারী কি চায়?

কিন্তু সংসার যাত্রা ক্রমশঃ অচল হয়ে উঠল, যা মাইনে পা কল্পনা তাতে আর কুলায় না। চাল ডালের দাম তো রেশানিংএর কল্যাণে ভীষণ রকম চড়া—তাও কুখাদ্য। দিন দিন স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্চে তার, টনিকে আর চলল না, বাধ্য হয়েই ডাকতে হল ডাক্তার।

নিয়মিত আসেন তিনি, ভিজিট নেন, ব্যবস্থা দেন লম্বা লম্বা কিন্তু তিন টাকার ওষুদ কিনতে হয় ব্ল্যাক মার্কেটে বারো টাকা দামে। আস্তে আস্তে বিছানা নিতে হল ওকে।

মুস্কিল হল প্রকাশের, একা কতদিক সামলাবে? অনেক দরবার করে দু'মাসের ছুটি মঞ্জুর হয়েছে কল্পনার। তা হলেও অনেক সমস্যা বাকী রয়ে গেল, তার একার আয়ে, বাড়ীর খরচ পাঠিয়ে যা থাকে তাতে দুজনার খাওয়া পরাই চলতে চায় না—আবার রোগীর পথ্য। অনেক কষ্টে জমান টাকা কটি দুদিনেই ফুরিয়ে গেল। তা না হয় গেল কিন্তু কল্পনাকে একা ফেলে রাখে কেমন করে।

অনেক দরদস্তুর করে, সুটকেশ আর বিছানা নিয়ে প্রকাশ কল্পনার ঘরে এসে হাজির হল। খাটিয়ার উপর শুয়ে ছিল কল্পনা—ওকে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—একি?

হাতের পুঁটলিটা ধপাস করে মাটিতে নামাল প্রকাশ—

মেসের বাসা উঠিয়ে দিয়ে এলাম; আজ থেকে এখানেই থাকব ঠিক করেছি।

তার মানে?

তার মানে বুঝলে না? দুজনের দু'জায়গাতে খরচ চালাবার সংস্থান আর আমাদের নেই—এক জায়গাতে থাকলে অল্প পয়সাতে চলবে, তাছাড়া তোমার ঘরভাড়া সস্তা। আর তোমাকেও একা থাকতে হবে না, অসুখে-বিসুখে আমাকেও এপাড়া ওপাড়া করতে হবে না।

বাঃ বেশ বুদ্ধি বার করেছ যা হোক্, ম্লানভাবে হাসল কল্পনা, লোকে কি বলবে না বলবে তার জন্য কেয়ার না করেই চলবে তোমার?

নিশ্চয়ই, যারা বলবে তারা আমার অসময়ে সাহায্য করবে না যখন, জোর দিয়ে বল্লে সে, তখন পরের ভাবনাতে আমিও মাথা—ঘামাব না। সে যাক্—এবেলা আছ কেমন? জ্বর আসেনি তো?

প্রকাশ ওর কপাল ছুঁয়ে দেখল, একি? জ্বর রয়েছে তো এখনও, মিঃ পীলাইকে একবার ডাকি।

পীলাই প্রকাশের সহকর্মী, বন্ধু। ভাল হোমিওপ্যাথির হাত ওর—নেহাৎ ও লাইনে লোকের বিশ্বাস নেই দেখে বেচারী হতাশ হয়ে অফিসের চাকরীতে ঢুকেছে। এ ডাক্তার, ও ডাক্তার করে অবশেষে চিকিৎসার ভার এর হাতে দেওয়া হয়েছে। লোকটি ভদ্র—তায় মিশুক, দু'দিনেই ওদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছে। কল্পনা বারণ করা সত্ত্বেও প্রকাশ পীলাইএর বাড়ীমুখো বেরিয়ে পড়ল। সৌভাগ্যক্রমে ওকে ঘরেই পাওয়া গেল। হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করল—কি খবর, এত তাড়া যে?

চল তোমার ব্যাগটা নিয়ে, তোমার রোগিনীর ফের জ্বর আসছে, তাই ডাকতে এলাম।

ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে পীলাই রওনা দিল, রাস্তায় আসতে আসতে সে বল্লে—একটা কথা বলব বোস, যদি কিছু মনে না কর।

নিশ্চয়ই না, প্রকাশ হেসে উত্তর দিল, তুমি আমাদের বন্ধু, তাছাড়া ভদ্রলোক যখন, তখন তোমার কথা শুনতে আপত্তি হতে পারে না।

হয়ত আমার অনধিকার চর্চা—পীলাই একটু ইতস্ততঃ করে বললে, আমার মনে হয় মিস্ রায়ের অসুখ সারছে না শুধু অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনায়। আচ্ছা এর কারণ বলতে পার?

নিশ্চয়ই পারি, বেচারীর সংসারে কেউ থেকেও নেই, অত্যন্ত ষ্ট্রাগলিং লাইফ ওর, আমার মনে হয় মনের সঙ্গে লড়াই করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও; সংক্ষেপে কল্পনার ইতিবৃত্ত জানাল ওকে—তুমিই বলনা এর কি উপায় হ'তে পারে?

দেখ বোস, পীলাই বল্লে, আমার মনে হয় তুমি ওকে বিয়ে করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়—যতই বল না কেন, এদেশে ভদ্রভাবে বেঁচে থাকতে হ'লে মেয়েদের যে কোন একজন পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করে নিতেই হবে নিজের সম্মান বজায় রাখবার জন্য। আর তোমরা দু'জনেই দুজনকে জানো এক্ষেত্রে তোমাদের মিলন তো সবচেয়ে ভাল হবে।

ভাল হতে পারে কিন্তু গণ্ডগোল তো ওইখানেই, বিয়ে আমরা করবই কিন্তু সংসারের ভার নেবার যোগ্যতা আজও হয়নি। বিশেষতঃ মনের যে অবস্থাতে একজন শুধু সংসারকেই একমাত্র অবলম্বন করে ধরতে পারে সে অবস্থা ওর নেই।

তার মানে?

তার মানে জানতে চাও? ও ঠিক একেলের মেয়ের মত শুধু গহনা, কাপড় আর ফ্যাসন নিয়ে ভুলে থাকতে পারে না, ও হচ্ছে শক্তিমতীর বংশধর, গ্রহণও করবে বলিষ্ঠভাবে দানও করবে নিজেকে নিঃস্ব করে। তাকে লাভ করবার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়।

সে যোগ্যতা কি তোমার নেই বলতে চাও ?

বলতে আমি কিছুই চাইনে, তবে এটা সত্যি যে শুধু গ্রহণ করলেই চলে না, ধরে রাখবার, বাঁচিয়ে রাখবার যোগ্যতাও থাকা দরকার, সংসার পাতবার সামর্থ্য আমাদের হয়নি আজও।

নিয়মিত যত্ন আর সেবার গুণে অল্প একটু সেরে উঠল কল্পনা। কুকারে খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রকাশ ওকে নিয়ে প্রায়ই বেড়াতে যায় গঙ্গার ধারে। খোলা হাওয়ায় ওর মনের স্ফূর্তি ফিরে আসতে লাগল।

ছুটির দিন এখানে ওখানে না ঘুরে ঘরেই আড্ডা জমাচ্ছে প্রকাশ। নিয়মিত ভাবে আসে শুধু পীলাই—তারও আপন জন কেউ নেই। সামান্য আয়ের চাকরী সম্বল করে মাতৃভূমি মাদ্রাজ ছেড়ে সুদূর বাংলায় চলে আসতে বাধা দেবার মত কেউ নেই। কল্পনারও প্রায় তাই। দু'জনে মিশ খেয়েছে সেজন্য আরও বেশী। ভাই ফোঁটার দিনে কপালে রক্তচন্দনের তিলক পরিয়ে আরও আপনার করে নিয়েছে ওকে।

অনেক দুঃখ, অনেক অপমান সয়েও যে চাকরীর উপর কল্পনার মমতা ছিল অনেকখানি, হয়ত অভাবের তাড়নায়, তাও ওকে ছাড়তে হ'ল এমন একটা আঘাত পেয়ে যার ফলে ওর রুগ্ন দেহমন আবার বিছানা নেবার উপক্রম করল।

ব্যাপারটা ঘটেছিল এই, বাকী মাইনেটা আনতে কল্পনা গিয়েছিল অফিসে। সবে রোগশয্যা ছেড়ে ওঠার ফলে পাণ্ডুর দেহ আর ক্লান্ত মন নিয়ে প্রথমটা সহকর্মীদের চাপা ইঙ্গিতপূর্ণ হাসাহাসি ও লক্ষ্যই করেনি। সোজা স্বপনের সামনে এসে দাঁড়াল—ভাল আছেন স্বপন বাবু?

হঠাৎ কল্পনার আগমনে চমকে উঠল স্বপন, একি হয়ে গেছে ও? যা শুনেছিল তাহলে মিথ্যে নয়—ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল সেও।

ভালই—

বেশী কথা বলা ওর প্রকৃতি বিরুদ্ধ তবু আহত হয়েই জিজ্ঞাসা করল—এত উদাসীন দেখাচ্ছে যে আপনাকে, শরীর খারাপ নাকি?

সেটা আপনার না জানলেও চলবে—মাথা নামিয়ে খাতার উপর ঝুঁকে পড়ল স্বপন, হয়ত চোখের কোণে একটু বাষ্প জমে উঠেছিল কিন্তু জানাবার পথ যে কল্পনা নিজেই বন্ধ করে ফেলেছে।

এখান থেকে ওখানে, অবশেষে কি ঘটেছে সেটা বুঝতে দেরী হল না কল্পনার—লম্বা ছুটী নেবার সুযোগে মোটা কমল আর ভবানী দাস এতদিনে পূর্ণ প্রতিশোধ নিয়েছে, ওর অসুস্থতার বিকৃত খবর রটিয়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে অফিসে সন্দেহ করবার মত কেউ

নেই। কামনার ইন্ধন না যোগাতে পারার শাস্তি মাথায় করে মাথা হেঁট করে ঘরে ফিরে এল সে।

মাতৃত্ব নারীর সবচেয়ে সেরা গৌরব আবার সবচেয়ে বড় লজ্জাও। কে জানত, ওর কুমারী জীবনের অকলঙ্ক চরিত্রকে এমন করে কালিতে ভরে তুলবে তারই মিথ্যা গুজব রটিয়ে! ছিঃ—

সমস্ত জেনে প্রকাশ পর্য্যন্ত স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার কি উপায় আছে এর প্রতিকার করবার? এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে দাঁড়াতে হয় সমগ্র যুবশক্তির বিরুদ্ধে, তাদের শত্রুতা মাথা পেতে নিয়ে। কিন্তু তাতেও কি প্রতীকার করা সম্ভব?

তবু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতেই ফোঁস করে উঠল কল্পনা—থাক্, তুমি আর তোমার স্বজাতীয়দের সাপোর্ট করতে চেষ্টা করোনা, আমি খুব ভাল করেই চিনেছি ওদের।

শান্তভাবে প্রকাশ উত্তর দিল, তুমিও গোলমাল করে ফেলেছ রাণু, আমি ওদের সাপোর্ট করতে চাইনি। আমি শুধু বলতে চাই পরাধীন দেশের কেরানীর জাত বদলে যাওয়া মনের এর চাইতে ভাল পরিণতি হতে পারে না। তার জন্য অনর্থক ব্যর্থ না হয়ে ভেবে দেখো —তোমার দৈন্য তোমাকে নীচু করতে পারেনি, আপনার হীনতায় ওরাই ছোট হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। এ জেনেও কি তুমি ওদের ক্ষমা করতে পারবে না?

কিছুতেই না, গর্ব্বিতস্বরে কল্পনা বল্লে—ক্ষমা সবলের ধর্ম্ম; দুর্ব্বলের নয়। আজ যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার উপায় আমার থাকত তাহলে ও কথা ভাবা যেত। কিন্তু কোন উপায় নেই দেখে বাধ্য হয়ে ক্ষমা এ আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তোমার যোগ্য কথা হল না রাণু।

আমারি যোগ্য কথা এ। রবীন্দ্রনাথ পড়েছো? তিনি বলেছেন—

অন্যায় যে করে আর
অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন
তৃণসম দহে।

অক্ষম লজ্জায় অন্যায় সয়ে যাবার মত মনের দুর্ব্বলতা আমার নেই। আমাদের সমাজে দুস্কৃতিকারীর দণ্ড নেই বলেই দিন দিন রক্তবীজের মত বংশ বাড়ছে ওদের। আমি যখন সেটা বুঝতে পেরেছি তখন ক্ষমা করে যেতে পারিনা কিছুতেই—আমি দণ্ড দেব।

কি করতে চাও?

আজ থেকে নূতন করে দেখতে শিখলাম। আগের দিনে লক্ষ্মীই ছিলেন আদর্শ মেয়ের লক্ষ্য, এবার থেকে ক'রব অলক্ষ্মীর উপাসনা, শক্তির উপাসনা—সংজ্ঞ গড়ে তুলব মেয়েদের। যে অন্যায় যে অপমানের অনুশাসন চলছে আমাদের নারী সমাজের উপর দিয়ে তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে এমন মেয়েদের তৈরী করবে আমার এই শিশুপ্রতিষ্ঠান। নূতন করে মানুষ গড়বে তারা।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ সমাজের পচা পুরানো আমলের ব্যবস্থা আমি বদলে দিতে চাই। আমার সমাজে উচ্চনীচের ভেদাভেদ থাকবে না, সহকর্ম্মীর মত, মানুষের মত বাঁচবার অধিকার থাকবে সকলের। পথভ্রষ্টদের জন্য থাকবে কঠিন আঘাতের ব্যবস্থা।

নূতন কথা তো তুমি বললেনা, এ যে সাম্যবাদের গোড়া পত্তন হচ্ছে।

স্থির দৃষ্টিতে কল্পনা ওর দিকে তাকাল—সাম্যবাদই তো। তফাৎ শুধু, থাকবে না এর মধ্যে বিদেশের অনুপ্রেরণার জন্য অপেক্ষা করা, আর দেশের মেয়েদের বুকের উপর দিয়ে কঠিন পীড়নের জগন্নাথের রথ চালান। আমার সাম্যবাদ হবে মেয়েদের বাদ দিয়ে নয়, ওদের কেন্দ্র করে। দেশের মা, বোন, মেয়ের পায়ে শিকল পরিয়ে নয়, তাদের বাঁচবার অধিকার দিয়ে—তাদের কথা বলবার সুযোগ দিয়ে।

অনেক দিনের তুষানল আজ হঠাৎ জ্বলে উথলে উঠেছে তার মনে। পথে, ঘাটে, ঘরে, সমাজে অনেক লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে—পুরুষের আর পুরুষের আদর্শের কাছ থেকে। তাতে ও টলেনি ; ওদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ওদের অবহেলা, অনুরাগ, অপবাদ সব কিছুকেই উপেক্ষা করে এসেছে এতদিন কিন্তু আজকের অপমান সে ভুলতে পারবে না কোনদিন। বিষের তেজে জ্বলে যাবার মত ছটফট করছে তার সারা শরীর……

কল্পনা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে বসল কল্পনা, মোমবাতির আলোতে লেখার অসুবিধা হল না একটুও, খস খস করে লিখে চল্ল, কোন দিকে দৃষ্টি নেই—আজ যেন ওর নূতন জন্ম, লেখিকা কল্পনা রূপে। দুঃখ, বেদনা আর প্রতি মুহূর্ত্তের অবমাননার ইতিহাস জানিয়ে দিতে হবে সারা দেশময়—জানাতে হবে আশায় ভরা নূতন দিনের কথা। দিতে হবে আত্মচেতনার মন্ত্র। চোখে আলো লাগতেই নিজের বিছানা ছেড়ে উঠে বসল প্রকাশ—একি রাত্রু?

দু'তিনবার ডাকবার পরে কল্পনা ওর দিকে চোখ ফেরাল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে—কি প্রকাশ?

এসব কি করছ, এত রাত্রে?

এই তো আমার কাজ, তুমি যে বলেছিলে লেখার ভিতর দিয়েই সবাইকে জানিয়ে দিতে এ যুগের মেয়েদের অবস্থা। বুঝিয়ে দিতে কতখানি তাদের নামিয়ে দিয়েছে তোমাদের পুরুষের সমাজ; তার জন্যে কতখানি গ্লানি এসে ঢুকেছে ঘরে ঘরে, কত আশার বাসা যাচ্ছে ভেঙে। যারা জানবে, বুঝবে—তারা মানুষ হবে।

প্রকাশ ওর কাছে এসে দাঁড়াল, জোর করে চেপে ধরল ওর হাত—আর কিছু লক্ষ্য নেই তোমার জীবনে?

কি থাকতে পারে আর? আমার কথায় কে কান দেবে? বরং লেখার ভিতর দিয়ে যদি দশজন লোকেরও মন ফেরাতে পারি—তাই কি কম? ওরাও একদিন আমারি কাজের সঙ্গী হবে।

তবু একা চলার দুঃখ তোমার যাবে কি করে? কোনদিন প্রয়োজন হবে না কি সাথীর?

তুমি কি বলতে চাও প্রকাশ?

ওকে কাছে টেনে নিল প্রকাশ। আমাকে নাও তোমার পথের সঙ্গী করে, তোমার কাজে তোমার কল্পনায় এগিয়ে যেতে—তোমার হাতখানা ধরে রাখবার সৌভাগ্য আমাকে দাও, দুজনে এগিয়ে চলি চলার পথে।

সবল হাতে চেপে ধরল কল্পনার হাত, সবল সতেজ, দুঃখজয়ীর হাত—এই হাতের বরমাল্য যে দুঃখজয়ীর সেরা দান।

বন্ধুর হাতে হাত মিলাল কল্পনা—তা আর হয় না প্রকাশ।

কেন হয় না রাহু।

ঘর বাঁধবার জীবন তো আমার নয়, পুরুষের পৃথিবীতে অক্ষম দুর্ব্বল শক্তিতে আঁকড়ে পড়ে থাকার মোহ আমার ভেঙ্গে গেছে। কি হবে এখানে ঘর বেঁধে? বালুচরের ঘর ক'দিন থাকে? আমার জীবন, আমার সাধনা পথ চিনিয়ে দেবে—আমারি মত আরও পাঁচটী মেয়েকে, নূতন চলতে শিখে সমস্যার পর সমস্যা যাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলছে।

তোমার পথ আপনার করে নেব বলেই তো আমার সংগ্রাম। যে দুঃখ দুর্দ্দশার পীড়নে ভরে উঠেছে সমস্ত সমাজ, তাকে দূর করে দেবার অভিযানের দায়িত্ব যে আমারও আধাআধি।

তুমি দেখবে পুরুষের মত কঠিনভাবে আমি দেখব স্নেহময়ী নারীর দৃষ্টিতে, তোমার আমার পথ তো এক হতে পারে না।

পথ কারো নয়, যে চলতে জানে—তারি সে। একপথের সঙ্গী হয়ে চলব আমরা, আমাদের ঘর আমাদেরি স্বপ্নে সার্থক হয়ে উঠবে নূতন সৃষ্টির আনন্দে—তারই ডাক এসেছে তোমারও। তুমি কি সাড়া দেবে না?

ব্যথিত চোখে কল্পনা ওর দিকে মাথা তুলে চাইল। প্রকাশ—ওর সঙ্গী সেই প্রথম যৌবনের দিন থেকে—দুঃখ দারিদ্র্য সমানভাবে ভাগ করে নিয়ে ওর সঙ্গে পাঠ্যজীবন থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত ওই তার সমস্ত প্রেরণা সমস্ত কল্পনার ছাপে রঙ্ ধরিয়েছে প্রতিদিন—তবু তাকেই দিতে হবে আঘাত। না প্রকাশ, ভুল বুঝো না আমাকে। যে জীবন পুরুষানুক্রমে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সৃষ্টি করে গেছেন তাই আজ হীনতার লজ্জায়, দীনতার বেদনায় নেমে যাচ্ছে অতলে। এর মাঝে নূতন সৃষ্টির কথা আমি ভাবতে পারিনা, কোথায় আনব তাদের? না, না, তা আমি পারব না। নারীর জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণামকে এমন করে অভিশপ্ত করে তুলতে আমি পারব না।

কিন্তু—

না কিন্তু না। দেশ জোড়া হাহাকারের অপমানের প্রায়শ্চিত্তের ব্রত আমি বরণ করে নিলাম। যে আঘাত তোমাদের হাত থেকে পেয়েছি তাকে সুন্দর করে ফিরিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখছি আমি। এ পথে তোমার সাহায্য নেবার উপায় নেই—আমি অপমানিতা নারী —আমার পথ চিনতে হবে আমাকেই।

হঠাৎ ওর চোখের দৃষ্টি জলে উঠল, ওর অবমাননার সেরা প্রতিদান এই ওর ভালবাসার অপমৃত্যু। পৃথিবী যাত্রার প্রথম দিন থেকে অত্যাচারী পুরুষকেও ভালবেসেছে নারী, সমস্ত হৃদয় দিয়ে আবৃত করে ধরেছে তাদের দীনতা, হীনতা আর অসঙ্গতিকে। তবু পুরুষেই করেছে আঘাত, কল্যাণী নারীকে করেছে অসম্মান, বদলে দিয়েছে তার রূপ। এর প্রতিকার করবে এ যুগের মেয়েরা অপমানের লজ্জার পাঁক থেকে বেঁচে উঠবার সংগ্রাম যাদের। সেই পথের সূচনাই